প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৬

প্রকাশক : অধীর চক্রবর্তী
প্রত্যয় প্রকাশ
১৭/২, জয়দেব কুণ্ডু লেন,
হাওড়া-১

মুদ্রক : শ্রীগৌরমোহন বাকুলী
নারায়ণ প্রিন্টার্স
১এ, গোঁসাই লেন
কলিকাতা ১০০ ০০৩

উৎসর্গ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

সুহৃদ্বরেষু

সূচীপত্র

☐ বিদ্যাসাগর ☐

পুণ্যশ্লোক প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদের চৈতন্যের সঙ্গে মিশে আছেন, আমাদের অস্তিত্বের গভীরে তাঁর স্মৃতির সঞ্চরণ। রামায়ণ মহাভারতকে যেমন আমরা ভারতের প্রাচীনকালের অমূল্য উত্তরাধিকার হিসাবে লাভ করেছি, তেমনি আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার বলতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনকেই বোঝায়। বাঙালী শিশু তার শিক্ষারম্ভের সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই একটি নামের সঙ্গে পরিচিত হয়—সে নাম বিদ্যাসাগরের। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপকদের বহুতর ত্রুটি আছে মানি কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে এসে তাঁদের শত দোষ ভুলে যেতে হয়, মাথা নত করতে হয় তাঁদের উদার কল্পনা ও দূরদৃষ্টির কাছে, যে উদার কল্পনা ও দূরদৃষ্টি বিদ্যাসাগরকে এ দেশের প্রচলিত ধর্মীয় মূল্যবোধে অবিশ্বাসী জেনেও তাঁকে চরিত্রবত্তা ও মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ আধার রূপে বাঙালী ছেলেমেয়েদের সামনে উপস্থাপিত করতে এতটুকু ভুল করেনি।

শিক্ষাব্যবস্থায় বহিরারোপিত নিয়ন্ত্রণের ('রেজিমেণ্টেশন') অযৌক্তিকতার কথা আমরা শুনে থাকি, কিন্তু কোমলমতি শিশুদের বোধোদয়ের উন্মেষের লগ্নে তাদের কী পাঠ্যবস্তু হওয়া না-হওয়া উচিত, তা নিরূপণের দায়িত্ব তো পক্ব-প্রবীণদের বিচারবুদ্ধির উপরেই ন্যস্ত করতে হয়—তা সে পক্ব-প্রবীণেরা বেসরকারী স্তরেরই হোন আর সরকারের সঙ্গেই যুক্ত থাকুন। এটা যদি 'রেজিমেণ্টেশন' হয়, তা হলে বলবো, 'রেজিমেণ্টেশন' প্রথার এত বড় সুফলপ্রসূ ও কল্যাণকারী প্রয়োগ আর কোনো দেশে কোনো কালে হয়েছে কিনা সন্দেহ। বাঙালী শিশুর পাঠ শুরু হয় বিদ্যাসাগরের জীবনীচর্চা দিয়ে, আমি বলবো, উত্তরকালে জীবনের পিচ্ছিল পথে চলতে গিয়ে সেই শিশু যত বাধা-বিঘ্ন, সংগ্রাম ও আত্মপরীক্ষা, দুর্দৈব ও ভাগ্যহীনতার সম্মুখীন হয়, তার সব-কিছুকে উত্তীর্ণ হওয়ার মহামন্ত্র নিহিত

আছে ওই একটি মাত্র সঞ্জীবনী নামের মধ্যে। মানুষ হওয়ার সাধনায় জয়ী হওয়ার পক্ষে রক্ষাকবচ স্বরূপ ওই একটি মাত্র নাম—বিদ্যাসাগর। মনে মনে 'রামনাম' জপ করলে নাকি বিপদভয় দূর হয়ে যায়—আমাদের দেশের এইরূপ জনশ্রুতি। বর্তমান যুগের অনুষঙ্গে আমরা রামনামের জায়গায় স্বচ্ছন্দে বিদ্যাসাগরের নামটি বসিয়ে নিতে পারি। তাতে ফলের কিছু ব্যত্যয় হবে বলে মনে করিনে, বরং সুফলের আশা আরও সুনিশ্চিত হবে বলেই বিশ্বাস। কেননা শ্রীরামচন্দ্র পুরাতন যুগের বীর, আর বিদ্যাসাগর আধুনিক কালের মানুষ। এ কালের সমস্যা, প্রশ্ন ও পরীক্ষা, জীবনযাত্রার ধারা ও ধরন পুরাতন কালের ওই সকল বস্তু থেকে কিছু ভিন্নতর। কাজেই রামনাম অপেক্ষা বিদ্যাসাগর নামের স্মরণ ও মননই এ যুগে অধিক ফলদায়ক হওয়ার সম্ভাবনা ; যদিও সঙ্গে সঙ্গে এ কথা বলা দরকার যে, পৌরাণিক রামচরিত্রের মধ্যে এমন কতকগুলি শ্রেষ্ঠগুণের সমাবেশ হয়েছিল, যা সর্বকালের অনুশীলনযোগ্য। আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তির মণিকোঠায় একই সঙ্গে একাধিক মহাপুরুষের স্মৃতিমহিমার জায়গা হতে পারে, হওয়া উচিত।

বিদ্যাসাগরকে কেন এত বড় বলছি সেটা একটু বিস্তারিত করে বলা প্রয়োজন। নয়তো মনে হতে পারে নিরবচ্ছিন্ন শ্রদ্ধার উচ্ছ্বাস থেকেই কথাগুলি বলা, তার পিছনে যথেষ্ট যুক্তির জোর নেই। আবার কারও কারও মনে হতে পারে আমার এই প্রাপ্তবয়স্ক মাহাত্ম্যকীর্তনের পিছনে বিচারহীন বাল্যের সংস্কারটাই প্রধানতঃ কাজ করছে, অতএব এই মাহাত্ম্য-কীর্তন সন্দেহস্থল। কাজেকাজেই কিছু কিছু বস্তুনিষ্ঠ তথ্যচর্চা দরকার। সেই চেষ্টাই এখন করব।

স্মরণ রাখতে হবে যে, বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন এক গ্রামীণ দরিদ্র কুলীন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরিবারে। সে পরিবারের দুর্ভেদ্য রক্ষণশীলতার প্রাচীর ভেদ করে ভিতরে আধুনিকতার হাওয়া চলাচল করতে পারে এমন কোনো ছিদ্রপথ দেওয়ালে ছিল না। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার, এমন একটি প্রথাবদ্ধ সনাতন ধ্যানধারণা-চালিত গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে

জন্মগ্রহণ করে বিদ্যাসাগর আধুনিকতার চূড়ান্ত করে ছেড়েছিলেন। কেমন করে এটা সম্ভব হয়েছিল ? সম্ভব হয়েছিল বিদ্যাসাগরের অনমনীয় চারিত্র-শক্তির জোরে, অজেয় পৌরুষের বলে। বিত্তহীন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জীবনের ধারা অনুধাবন করলে এই একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে, প্রায়শই তাঁরা তেজস্বী ও সত্যনিষ্ঠ হন। তাঁদের রক্ষণশীলতা আর গোঁড়ামি যুক্তিবহির্ভূত মনোভাবপ্রসূত হলেও, সেই রক্ষণশীলতা আর গোঁড়ামিকে বাঁচিয়ে রাখার নিষ্ঠায় একদা তাঁরা যে সাহস দেখাতেন, সেই সাহসের সামনে অনেক সময় গ্রামের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারও কেঁচো হয়ে যেতেন। উত্তরীয়সম্বল গরীব সৎ ব্রাহ্মণ প্রবলের অত্যাচার আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন এমন দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না এককালে আমাদের দেশের গ্রামঘরের ইতিহাসে।

গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবার হলেও, এমনি এক তেজস্বী বংশে বিদ্যাসাগরের জন্ম। আর এই তেজস্বিতাকেই বিদ্যাসাগর তাঁর সমগ্র জীবনের সংগ্রামে ও কর্মসাধনায় অফুরন্ত মূলধনরূপে ব্যবহার করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের দয়াবৃত্তি নিয়ে বহু গল্প-কাহিনী আমাদের সমাজে প্রচলিত। দয়াবৃত্তি নিশ্চয়ই তাঁর চরিত্রের একটি মহদ্‌গুণ ছিল, কিন্তু কেবলমাত্র দয়াবৃত্তির প্রণোদনায় বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর হন নি। তাঁর স্বভাবে সেই অসামান্য তেজস্বিতা ছিল, যে তেজস্বিতার বলে তিনি তাঁর দয়াবৃত্তিকে প্রায় সর্ব-ক্ষেত্রেই সার্থক করে তুলতে পেরেছিলেন। দয়াবৃত্তি অনেকেরই মধ্যে থাকে, ক্রূর হৃদয় নিয়ে খুব কম মানুষই সংসারে ভূমিষ্ঠ হয়, কিন্তু দয়া-বৃত্তিকে এই কঠিন-কুটিল সংসারে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না। সংসারের কাছ থেকে নানাবিধ ঘা খেয়ে মানুষ যত জীবন পথে অগ্রসর হতে থাকে, ব্যর্থতার মনস্তাপে ও বেদনায়, স্বার্থের মন্ত্রণায় আর আত্মরক্ষার তাড়নায় তত তার দয়ার সঞ্চয়ে টান ধরতে থাকে। খুব সাহসী ব্যক্তি না হলে এ সমাজে দয়া প্রবৃত্তিকে বেশীদিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

বিদ্যাসাগর ছিলেন সেই বিরল সাহসিকদের একজন, যিনি তাঁর সহজাত তেজস্বিতা সংগ্রামশীলতার গুণে দয়াধর্মকে তার অভ্যস্ত গতানু-

গতিক পরিবেশ থেকে মুক্ত করে তাকে মানবতার সর্বোচ্চ গৌরবের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নইলে এ কথা কে কবে ভাবতে পেরেছিল যে, যে মানুষটি গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের আবেষ্টনীতে লালিত-পালিত হয়েছেন, সংস্কৃত শিক্ষার খাতে ঐতিহ্যানুমোদিত বিদ্যার্জন করে সংস্কৃত কলেজ থেকে লাভ করেছেন তার শ্রেষ্ঠ উপাধি 'বিদ্যাসাগর', জীবনযাত্রার ধারায় ও বেশভূষায় যিনি ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালী, উপরন্তু খাঁটি ব্রাহ্মণ ; সেই মানুষটি আমাদের সমাজের বালবিধবাদের দুঃখে বিগলিত হয়ে তাদের পুনর্বিবাহ প্রচলনের জন্য তাঁর সমগ্র কর্মশক্তি, অর্থবিত্ত ও সময় সর্বস্ব নিয়োগ করবেন ? অপরের দুঃখে অনেকেরই প্রাণ মায়ের মত কাঁদে ; কিন্তু হায়, সেই ক্রন্দনপরতার কারুণ্যকে তার ন্যায়সঙ্গত পরিণতিতে টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো দৃঢ়তা ও মনোবল শতকরা নিরানব্বুই জন লোকের মধ্যেই থাকে না। বিদ্যাসাগরের ছিল প্রভূত পরিমাণে, আর তাই তো তিনি গোটা বাঙালী সমাজদেহটাকে ধরে এমন সবেগে নাড়া দিতে পেরেছিলেন, যে আলোড়নে একদা প্রচলিত সমাজের ভিত শুদ্ধ কেঁপে উঠেছিল। কি বিধবার পুনর্বিবাহ আন্দোলন, বহুবিবাহ নিরোধ আন্দোলন, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন, শিশুশিক্ষার ভিত্তি নির্মাণ প্রভৃতি যাবতীয় অগ্রসর প্রচেষ্টার পিছনে বিদ্যাসাগরের যে মনটি কাজ করেছে তা অমিত বিপ্লবের তেজে পূর্ণ একটি দুর্ধর্ষ সংগ্রামী মন। তাঁকে সমাজসংস্কারক আখ্যা দিলে খুব কমই বলা হয়, উপযুক্ত পরিপার্শ্ব আর ভিন্নতর কর্মক্ষেত্র পেলে এই মানুষটিই কোন্-না বিপ্লবী নায়কে রূপান্তরিত হতে পারতেন।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজে লেখাপড়ায় নিমগ্ন, সেই সময়ে ওই কলেজেরই অপর পার্শ্বে অবস্থিত হিন্দু কলেজে "ইয়ং বেঙ্গল" সম্প্রদায় শিক্ষক ডিরোজিওর নেতৃত্বে প্রচণ্ড এক বিদ্রোহের আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। বাঙালী জীবনের নানাবিধ অর্থহীন আচার, মূঢ়তা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ডিরোজিও-শিষ্যদের বলিষ্ঠ প্রাণের প্রতিবাদ উদ্যত বজ্রের মতো নেমে এসেছিল নিশ্চল সমাজের বুকের উপর অমোঘ

কঠিনতায়। ডিরোজীয়দের আচরণে কিছু আতিশয্য ছিল সন্দেহ নেই, যৌবনোচিত উৎসাহে নতুন জীবনরীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল, সে কথাও ঠিক ; কিন্তু এ কথা তো কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁদের সকলেরই মধ্যে ছিল শ্রেষ্ঠ সততা ও চরিত্র শক্তির ব্যঞ্জনা, অপরিমেয় দেশপ্রেম ও ঐকান্তিক বিদ্যানুরাগ। পাশ্চাত্ত্য রেনেশাঁসের কয়েকটি উৎকৃষ্ট গুণ—যথা, নবীনত্বপ্রীতি, যুক্তি-জ্ঞান, অতীত বিদ্যাকে আধুনিক চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে সংগ্রথিত করার চেষ্টা, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, সমাজকল্যাণেচ্ছা প্রভৃতি—তাঁদের ভিতর সহজ অধিকারের মতোই স্বচ্ছন্দভাবে বর্তিয়েছিল। একাধিক ডিরোজীয়ের পরবর্তী জীবনের কার্যকলাপ থেকেই এ কথার প্রমাণ তুলে ধরা যায়।

হিন্দু কলেজের "ইয়ং বেঙ্গল" সম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তির কালে বিদ্যাসাগরের বয়স নয় কি দশ। একাগ্র মনে তিনি তখন পড়াশুনায় ব্যস্ত। "ইয়ং বেঙ্গল"দের কার্যকলাপের পরিপূর্ণ তাৎপর্য বোঝবার মতো পরিণত মন তাঁর তখনও হয়নি, হওয়ার কথাও নয়। কিন্তু এ কথা অনুমান করলে কি ভুল হবে যে, "ইয়ং বেঙ্গল" আন্দোলনের আগুনের আঁচ ওই বালকটির মনে এসেও লেগেছিল আর তাঁকে ভিতরে ভিতরে উদ্দীপিত করে তুলেছিল ? এত বড় একটা আলোড়নবিলোড়ন সৃষ্টিকারী বিদ্রোহী কর্মকাণ্ডের প্রভাব এত নিকট পরিধির মধ্যে থেকেও ঈশ্বরচন্দ্রের মতো অসাধারণ মেধাবী বালকের সংবেদনশীল চিত্তকে চঞ্চল করে তোলেনি—এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বালক ঈশ্বরচন্দ্র যে "ইয়ং বেঙ্গল" আন্দোলনের দ্বারা বিলক্ষণ প্রভাবিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ, সংস্কৃত কলেজ থেকে শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি যখন বাইরে বেরিয়ে এসে কর্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশের সূত্রপাত করলেন, তদবসরে তিনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির পঠন-পাঠনায় ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য প্রভূত শ্রম করেছিলেন। ইংরেজী ভাষায় অধিকারও তিনি এই সময় পাকা করে তোলেন। আমাদের দেশের প্রথাবদ্ধ প্রাচীন দর্শন শিক্ষার অসারতা আর ইউরোপীয় যুক্তিজ্ঞানকর্ষিত রেনেশাঁসী মূল্যবোধ শাসিত সাহিত্য ও নূতন

দর্শনের পাঠ গ্রহণের উপযোগিতার বোধ তখন থেকেই তাঁর মনে বদ্ধমূল হতে আরম্ভ করে। আর তাই তো দেখতে পাই, সংস্কৃত কলেজে কর্মগ্রহণ করার পর তিনি প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর সংস্কারের সুপারিশ করে ১৮৫০ সালে এডুকেশন কাউন্সিলকে এক রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন, যার মূল কথা হলো প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যধারায় পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাদানেরও প্রবর্তন করতে হবে। এর তিন বছর পর কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ব্যালেণ্টাইন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনের পর যে রিপোর্ট পেশ করেন, এডুকেশন কাউন্সিলের কাছে তারও তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন একই মনোভাবের বশে। মিঃ ব্যালেণ্টাইন তাঁর রিপোর্টে প্রাচ্যবিদ্যার উপর সমূহ জোর দিয়েছিলেন এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও দর্শনের কেবলমাত্র সেই সকল পাঠ্যবস্তুকে সিলে-বাসের অন্তর্ভুক্ত করবার কথা বলেছিলেন, যেগুলি প্রাচ্যবিদ্যার সঙ্গে সমন্বয়যুক্ত। বিদ্যাসাগর এই সমন্বয়ের বাতিককে কঠিন ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন এবং এমন বৈপ্লবিক অভিমত পর্যন্ত প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি যে, "বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্তসমূহ ভ্রান্ত"। তিনি পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সম্যক অনুশীলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য ব্যাকরণ গণিত জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় পাশাপাশি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তারও উল্লেখ করেন বিশেষভাবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠক্রম গড়ে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

কতখানি মনের জোর থাকলে বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনকে ভ্রান্ত বলে রায় দেওয়া যায় ও তাদের বদলে পাশ্চাত্ত্য দর্শন চর্চার অনুকূলে মত প্রকাশ করা যায়, তা সকলকে বিবেচনা করে দেখতে বলি। অবশ্য, বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনের সিদ্ধান্তসমূহ ভ্রম প্রমাদপূর্ণ কি না সেটা বিচার-সাপেক্ষ এবং এই নিয়ে মতভিন্নতা অনিবার্য, কিন্তু কেউ যে উনিশ শতকের মধ্যভাগে, যখন এ দেশের সমাজে ও শিক্ষাজগতে পুরাতন প্রথাসিদ্ধ ধ্যান-ধারণা আর মূল্যবোধেরই আধিপত্য, পূর্ববর্তী অধ্যায়ের

একমাত্র রাজা রামমোহন রায় আর সমসাময়িক কালের ইয়ং-বেঙ্গল-এর দল আর অক্ষয়কুমার দত্তের মতো কিছুসংখ্যক "র‍্যাডিকাল"-এর উদাহরণ বাদ দিলে অগ্রসর চিন্তাচর্চার সূচনাই হয়নি যে যুগে বলতে গেলে, সেই কালের বুকে বসে একজন সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাংখ্য-বেদান্তকে নস্যাৎ করে দিচ্ছেন—এর বৈপ্লবিকতার কি কোনো তুলনা আছে ?

কোথা থেকে তিনি এই বৈপ্লবিকতার তেজ পেয়েছিলেন ? পেয়েছিলেন তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজ-পরিবেশ থেকে, অজ্ঞতা-মূঢ়তায় সমাচ্ছন্ন স্বসমাজের মানুষগুলির শোচনীয় দুর্দশা দেখে ব্যথাহত চিত্তে যে প্রতিকার-বাসনা জেগেছিল তার ঐকান্তিক আবেগ থেকে, প্রগতির দুর্মর আকাঙ্ক্ষা থেকে। বিদ্যাসাগরকে কেবলমাত্র "দয়ার সাগর" বানিয়ে রাখলে দান-ধ্যান আর বদান্যতার কীর্তিকে বড় করে দেখা আমাদের একটি সনাতন অভ্যাসের পরিতৃপ্তি হয় বটে, কিন্তু তাঁর সংগ্রামশীলতা প্রাগতিক চেতনা আর অমিত বীরত্বের সামান্যই প্রকাশ করা হয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিদ্যাসাগর সেই সময়কার প্রত্যেকটি প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে সম্পৃক্ত ছিলেন। বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ নিরোধ, স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার এগুলির কথা তো পূর্বেই উল্লেখ করেছি—বস্তুতঃ তিনিই ছিলেন এই আন্দোলনগুলির নেতা—এছাড়াও তাঁর প্রগতি-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় আরও নানা দিকে। ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন এইরূপ একটি দিক যার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অতিশয় ঘনিষ্ঠ। নিজে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন না, প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্মের করণ-কারণের প্রতিই যে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, তাঁর জীবনেতিহাসের পরিজ্ঞাত ছক থেকে অন্ততঃ তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঈশ্বর আছেন কি নেই, থাকলে তাঁর স্বরূপ কী প্রকার—এই সমস্ত বিতর্কের জটিলতার মধ্যে তাঁর মন প্রবেশ করতে চাইত না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের প্রশ্নে নীরব থাকাই তিনি তাঁর সহস্রকর্মযজ্ঞ পরিপূর্ণ ব্যস্ত জীবনের পক্ষে যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন এবং কখনও "মেটাফিজিক্যাল" প্রশ্নের দ্বারা আপনাকে উদ্ব্যস্ত করে তোলেন নি।

তাহলেও তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলনের মতো একটি মূলতঃ ধর্মীয় আন্দোলনের বৃত্তের মধ্যে কেন ধরা দিয়েছিলেন ? শুধু তাই নয় বেশ কয়েক বছর তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকীয় মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন, বেশ কিছুকাল আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদেও সমাসীন ছিলেন। এই আপাত স্বতোবিরোধের কী ব্যাখ্যা ?

ব্যাখ্যা এই যে, ব্রাহ্ম আন্দোলন মূলতঃ একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হলেও সেটি ছিল তৎকালের পক্ষে একটি অসমসাহসিকতাপূর্ণ বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। সনাতন মূর্তিপূজার দেশে নিরাকার ভজনার আদর্শের প্রবর্তন চেষ্টা সহজ ব্যাপার ছিল না, এবং পদে পদে হিন্দু রক্ষণশীল ধর্মধ্বজীদের দ্বারা সে চেষ্টা ব্যাহত হয়েছে। রামমোহনের মতো অসামান্য ব্যক্তিত্বধর পুরুষপ্রধান আন্দোলনের নেতৃত্ব না করলে, আর পরে তাঁর অবর্তমানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মতো ঐকান্তিক ভক্ত ধর্ম-পিপাসু আন্দোলনের হাল ধারণ করে না থাকলে, ব্রাহ্ম আন্দোলনের কী গতি হতো বলা কঠিন। ব্রাহ্ম আন্দোলনের একাধিক প্রগতিশীল সংস্কারচেষ্টা বাঙালী সমাজকে আধুনিকতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত করে দিয়েছে। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের একটি মুখ্য কারক শক্তিই হলো ব্রাহ্ম আন্দোলন।

আর ঠিক এই কারণেই বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং নানা ভাবে তার পোষকতা করেছেন। পরে অবশ্য তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু সে অন্য কারণে। দেবেন্দ্রনাথের অনুগামীদের সঙ্গে নব্যপন্থী কেশবচন্দ্রের দলের কোন্দলের সূত্রপাতে ব্রাহ্মসমাজের আবহাওয়া যখন ঘুলিয়ে উঠতে থাকল, তিনি বিরক্ত হয়ে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলেন। তবে ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যক্ষ প্রভাববলয় থেকে বেরিয়ে এলেও সে প্রভাব যে তিনি একেবারে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন তা মনে হয় না। অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, বিদ্যাসাগরের বহুখ্যাত 'বোধোদয়' পুস্তকের পরবর্তীকালীন সংস্করণ-গুলিতে ওই যে গোড়াতেই "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ" বলে বর্ণনা

আছে, তা ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবের ফল। ঈশ্বরচন্দ্রকে তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজ সাধারণতঃ অজ্ঞেয়বাদী বা 'অ্যাগনষ্টিক' মনে করতেন, গোঁড়া হিন্দুয়ানির ধারক-বাহকদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে "পাষণ্ড-নাস্তিক" আখ্যা দিয়ে সম্মানিত করতেও দ্বিধা করেন নি, কিন্তু তাঁর প্রকৃত পরিচয়টি বোধোদয়ের ওই তাৎপর্যপূর্ণ পংক্তিটির মধ্যে নিহিত আছে। অর্থাৎ, তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু মূর্তি পূজার সংস্কার মানতেন না। তবে অন্য অনেক দেশী-বিদেশী প্রখ্যাতনামা মানবতাবাদী ভাবুকের মতোই বিদ্যাসাগরের বেলায় নিরীশ্বরবাদ আর আস্তিক্যের মধ্যে পার্থক্য-রেখা ছিল খুবই ক্ষীণ।

বিদ্যাসাগরের গুণাবলী নানা জন নানা ভাবে কীর্তন করেছেন। এই একটি মানুষ, যাঁর সামনে এসে সকল মত ও তন্ত্রের মানুষ শ্রদ্ধায় মস্তক নত করেছেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন। বাঙালী সমাজে কৃতী মানুষের অভাব নেই। বিদ্যায় বৈদগ্ধ্যে, মনস্বিতার সাংস্কৃতিক উৎকর্ষে, সৃজনশীলতার দীপ্তিতে বিদ্যাসাগরের প্রতিভাকে নিষ্প্রভ করে দিতে পারে এমন ব্যক্তি গত দুশো বছরের বাংলার ইতিহাসে একাধিক জন্মেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর চরিত্র অনন্য, একক। তাঁর তুলনা তিনি স্বয়ং—আগে-পরের আর কারও সঙ্গেই তাঁর সাদৃশ্য নেই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অপরিসীম হৃদয়বত্তার অধীশ্বররূপে বর্ণনা করেছেন এবং অনবদ্য শ্রীছাঁদময় বাংলা গদ্যরীতির স্রষ্টার সম্মান দিয়েছেন; চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সংস্কারমুক্ত মনের ছবিটি ফুটিয়ে তুলেছেন স্বকীয় প্রসিদ্ধ জীবনী গ্রন্থটিতে; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন, তিনি ছিলেন বাঙালী সমাজের লতা-গুল্মের ঝোপের মধ্যে বনস্পতিসদৃশ বিরাট মহীরূহ; শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ক্ষুরধার আত্মমর্যাদাজ্ঞানের একাধিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন বঙ্গীয় পাঠককুলের সমক্ষে; আচার্য সুনীতিকুমার বলেছেন বাংলা গদ্যরীতিতে বিদ্যাসাগরের যতিস্থাপন প্রচেষ্টা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সমতুল্য সংস্কার; সমাজবাদী সমালোচক বিনয় ঘোষ বলেছেন, বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর যুগে বিদ্যাকৌলীন্য ও বিত্তকৌলীন্যের

এক সংগ্রামী যুগ্মমূর্তি ; আরও বিভিন্ন জন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্যাসাগর চরিত্রের উপর আলোকপাত করেছেন। কিন্তু যিনি যে ভাবেই বিদ্যাসাগরের মহনীয়তাকে ফুটিয়ে তুলুন না কেন, এই এক বিষয়ে সকলেই একমত যে, এত বড় আত্মমর্যাদাদৃপ্ত তেজস্বী ও সাহসী মানুষ বাঙালী জাতির মধ্যে আর জন্মগ্রহণ করেন নি। যুদ্ধক্ষেত্রই সাহস প্রদর্শনের একমাত্র ক্ষেত্র নয়, কর্মজীবনের দৈনন্দিন বিচরণক্ষেত্রেও সাহস দেখানোর বহুতর সুযোগ উন্মুক্ত রয়েছে, আর এই ক্ষেত্রের সাহসটাই সমধিক অভিনন্দন যোগ্য।

একদিক থেকে দেখতে গেলে, বিদ্যাসাগরের সাহস তাঁর দয়াবৃত্তিরই রূপান্তরিত বেশ মাত্র। সেটা তাঁর দয়ারই নামান্তর। তাঁর অদম্য অপ্রতিরোধ্য দয়া প্রবৃত্তি তাঁকে দুর্দান্ত সাহসে প্রণোদিত ও ব্যাপৃত না করা পর্যন্ত শান্ত বা নিরস্ত হয় নি। গড়পড়তা সাধারণ মানুষ অল্পতেই রণে ভঙ্গ দেয় ; কিন্তু এই মানুষটি ছিলেন কিছু ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তিনি দয়ার শেষ দেখে ছেড়েছিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে বিদ্যাসাগরের জীবন ব্যর্থ হয়েছিল। শেষ বয়সের যে বিদ্যাসাগরের ছবিটি আমাদের মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে, তা এক ভগ্নক্লান্ত দেশবাসীর অপরিমাণ অকৃতজ্ঞতায় ক্ষুব্ধ আহত ব্যথিত মানুষের ছবি। বেদনার মনস্তাপে জর্জরিত বিদ্যাসাগর কলকাতার সমাজ থেকে পালিয়েসাঁওতাল পরগণার নিরক্ষর সরল আদিবাসী মানুষগুলির মধ্যে সান্ত্বনার আশ্রয় খুঁজেছিলেন জীবন-সায়াহ্নে। কিন্তু দৃশ্যতঃ যা ব্যর্থতা, তার মধ্যেই রয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ চরিত্রমহিমার সংকেত। নিজ জীবনে ব্যর্থতা-বরণ করেও তিনি উত্তর কালের বাঙালীকে তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ উপহার দিয়ে গেছেন—চরিত্র সম্পদ।

□ মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র □

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার শতবর্ষপূর্তির বৎসরে আমাদের বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের মনস্বিতার রূপটিকে স্মরণ করা দরকার। বঙ্কিমের অসাধারণ সৃষ্টিশীল প্রতিভার মূল্যায়ন করে বাংলায় অজস্র আলোচনা-সমালোচনা লিখিত হয়েছে, বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁর অদ্যাবধি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকার বিচার-বিশ্লেষণ করে বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে; কিন্তু মনে হয় সেই অনুপাতে বঙ্কিম-মনীষার দিকটি তেমন করে আমাদের সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি যেমনটা হওয়া উচিত ছিল বাংলা সাহিত্যের এই অন্যতম প্রধান দিক্‌পালের ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক মূল্যায়নের তাগিদে। অধুনালুপ্ত বঙ্গদর্শন পত্রিকার জন্মশত-বার্ষিক আমাদের সামনে এই শেষোক্ত সুযোগ এনে দিয়েছে। এই সুযোগের যদি আমরা সদ্ব্যবহার না করি তা হলে ভবিষ্যৎ-বংশীয়েরা আমাদের ক্ষমা করবে না।

এ কথা সত্য যে, বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় বঙ্কিমের উপন্যাস এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধ দুই ধরনের রচনাই যুগপৎ প্রকাশিত হয়েছে এবং ভূরি-পরিমাণ প্রকাশিত হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের সব্যসাচীরূপ, বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠাই ছিল সেই সব্যসাচীত্বের সাক্ষাৎ প্রয়োগ স্থল: এক হাতে তিনি সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন, অন্য হাতে তিনি সৌন্দর্য সৃষ্টির মাপকাঠি নিরূপণ করেছেন এবং যেসব রচনা এই পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ তাদের সম্পর্কে কঠোর সমালোচনার ভাষা ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ বঙ্গদর্শন পত্রিকাকে অবলম্বন করে একই সঙ্গে বঙ্কিম প্রাণন ও মনন, সৃষ্টিশীলতা ও বুদ্ধিজীবিতা, কল্পনার স্ফূর্তি ও দার্শনিকতা—এই আপাত-বিরুদ্ধ দ্বিবিধ ক্ষেত্রে সার্থকভাবে বিচরণ করেছেন। ইংরেজ সমালোচক স্যার আর্থার কুইলার-কৌচ কথিক লিটারেচার অব্ পাওয়ার

আর লিটারেচার অব্ নলেজ বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই সবচেয়ে সমন্বিত রূপ লাভ করেছিল।

কিন্তু বঙ্গদর্শন বঙ্কিমের এই যুগ্মরূপের আত্মপ্রকাশের বাহন হলেও, যদি একটিমাত্র পরিচয়ে বঙ্গদর্শনকে চিহ্নিত করতে হয় তো বঙ্কিমের মনীষার রূপের সঙ্গে যুক্ত করেই বঙ্গদর্শনের সেই পরিচয় ব্যক্ত করা ভালো। কেননা, উপন্যাসাবলী অন্য কোন পত্রিকাতেও প্রকাশিত হতে পারতো, অথবা সোজাসুজিই গ্রন্থাকারে সংবদ্ধ হয়ে বাজারে বেরুতে পারতো ; কিন্তু বঙ্গদর্শন সম্পাদনার সূত্রে বঙ্কিমের আরেকটি যে-ভূমিকা প্রকটিত—তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের নেতৃত্বদান ও রুচি-নির্মাণ, সৎ-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণ ও অসৎ সাহিত্যের ধিক্করণ, শক্তিমান উদীয়মান লেখকদের যথাযথ পথে সঞ্চালন অর্থাৎ অভিভাবকত্বকরণ, নানা বিচিত্র বিষয়ে পাণ্ডিত্য ও চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধের সংরচন, নবপ্রকাশিত পুস্তকাদির সমালোচন ইত্যাদি—সেই বহুমুখী সুফলপ্রসূ মনস্বিতার ভূমিকার আর কী ভাবেই বা আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারতো, যদি ১৮৭২ সালে বঙ্কিম বঙ্গদর্শন প্রকাশ না করতেন, একটানা চার বছর তার হাল ধারণ করে না থাকতেন ; পরে আরও পাঁচ বছর কাল অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের বকলমে পত্রিকাটির কার্যত সম্পাদকতা না করতেন ? প্রত্যেক সার্থক কাজেরই একটি নিমিত্ত বা উপলক্ষ্য থাকে। বঙ্গদর্শন ছিল বঙ্কিমের মনীষী ব্যক্তিত্বের প্রকটনের সেই নিমিত্ত বা উপলক্ষ্য। এই কাগজের পৃষ্ঠায় তার দুর্ধর্ষ সম্পাদক যেমন একদিকে সাহিত্য সমালোচনা ও সাহিত্য-গ্রন্থাদির মূল্যায়ন করেছেন, অন্যদিকে তেমনি ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, দেবতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, নীতিতত্ত্ব, জ্যোতিষ, ভূ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের উপর লেখনী চালনা করে প্রমাণ করেছেন ভগবানের রাজ্যে তাঁর কৌতূহল কত বহুপথগামী আর অধিকার কত দূর বিস্তৃত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রেরই মনস্বিতার আদর্শে গঠিত পরবর্তীকালের মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বঙ্কিম মনীষার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এইভাবে : "বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পড়িবার সময়

তিনি যে সে সময়ের কোন তত্ত্বটা জানিতেন না, এ দেশের বা ইউরোপের কোন লেখকের বা পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না, ইহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। এদেশের বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, মন্বাদিস্মৃতি, সাংখ্যবেদান্তাদি দর্শন, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, ভবভূতি প্রভৃতির কাব্য, রামায়ণ-মহাভারতাদি ইতিহাস, ভাগবতাদি পুরাণ, নানাবিধ তন্ত্র, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ এ সকলের সঙ্গে তাঁর কতটা যে পরিচয় ছিল, তাঁর উপন্যাসে, প্রবন্ধাবলীতে, কৃষ্ণচরিত্রে, গীতাভাষ্যে ইহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে ইউরোপীয় দার্শনিক কাণ্ট, হেগেল, কুঁজো, কোঁত এবং ইংরাজ চিন্তানায়ক স্পেন্সার, মিল, বেন্থাম, হকসলি, টিণ্ডেল, ফ্রেডারিক হ্যারিসন প্রভৃতি, আর একদিকে ম্যাথু আর্ণল্ড, রেণাঁ প্রভৃতি, এমন কি আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব বা spiritualism বা মেসমেরিজম (mesmerism) পর্যন্ত তাঁর কতটা কেবল জানা নয়, আয়ত্ত ছিল—এ সকলের বিস্তর প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে রহিয়াছে।”

বিপিনচন্দ্রের এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিম-মনীষার একটা ধারণা পাওয়া সুলভ হবে, বস্তুত বিপিনচন্দ্রের এই প্রশস্তিমূলক বর্ণনায় আমাদের কাজটাই—এই প্রবন্ধের যা উদ্দিষ্ট—অনেকগুণ সহজ হয়ে গিয়েছে। মনস্বিতার উদাহরণ ধরে ধরে পরিচয় দিয়ে সমগ্র প্রবন্ধের বিস্তারের মধ্যে যে কাজ নিষ্পন্ন হওয়ার কথা, সে কাজটি বিপিনচন্দ্র একটি অনুচ্ছেদের সীমিত দৈর্ঘ্যের মধ্যেই সম্পন্ন করে দিয়ে গেছেন। কিন্তু বিপিনচন্দ্রের প্রশস্তিকে আরও বোধহয় খানিকটা টেনে বাড়ানো যায়। যে কথাটা বিপিনচন্দ্রের মন্তব্যে উক্ত হয়নি তা হলো ঃ বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বে যুগপৎ সৃষ্টিধর প্রতিভা আর মনস্বিতার সুষ্ঠু সমন্বয়ের সংঘটন। এমনতর অত্যাশ্চর্য দৃষ্টান্ত শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসেও খুব বেশী আছে বলে আমাদের জানা নেই।

কেউ কেউ আমাদের এ কথাকে অতিশয়োক্তি বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু বেশ ভেবেচিন্তেই কথাটা আমি প্রয়োগ করেছি। পুনরপি বলি, ক্ষুরধার মনস্বিতা আর অপূর্ব-সৃজনকুশলতাকে যদি বাংলা সাহিত্যের

কোনো প্রধান পুরুষের মধ্যে সমন্বিত আকারে একাধারে দেখতে হয় তো সেই প্রধান পুরুষ হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এমন কি, সবিনয়ে বলবো, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তও এই দিক্ দিয়ে বঙ্কিমের দৃষ্টান্তের পাশে ন্যূন তথা অপূর্ণতার লক্ষণাক্রান্ত বলে মনে হতে পারে। বঙ্কিমের মনস্বিতার মধ্যে একটা যাকে বলে 'অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিন' বা প্রণালীবদ্ধ শিক্ষাগত শৃঙ্খলাবোধ ছিল। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তেমন ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের মতো নিয়মনিষ্ঠভাবে ইতিহাসের বা দর্শনের বা সমাজ-বিজ্ঞানের চর্চা করেন নি। বিদ্যার প্রণালীবদ্ধ চর্চায় যে বিশ্লেষণাত্মক তথ্যনির্ভর অমোঘ যুক্তিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়, রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর অনবদ্য সংশ্লেষণাত্মক প্রতিভার বলে সেই তথ্যাশ্রয়ী যুক্তিজ্ঞানের অনুশাসনকে এড়িয়ে গেছেন। হয়তো মূলত কবি বলেই রবীন্দ্রনাথের বেলায় এই অনুশাসনের তেমন প্রয়োজন হয় নি। তাঁর ছিল অসামান্য কাল্পনিক ও ভাবগ্রাহী মন, তাল তাল তথ্যের পুঞ্জ মন্থন করে দীর্ঘস্থায়ী যুক্তির সরণী বেয়ে একজন প্রথা ও প্রণালীবদ্ধ বিদ্যানুশীলনকারী সচরাচর যে ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হন, রবীন্দ্রনাথের মতো কবির পক্ষে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের (the sixth sense) অনুভবগম্যতাই যথেষ্ট ছিল। ভূরি পরিমাণ তথ্যের স্তূপ না ঘেঁটেই তত্ত্বের সারাৎসারে উপনীত হবার তাঁর দুর্লভ ক্ষমতা ছিল। এই সংশ্লেষণাত্মক অভ্রান্ত অনুমান ক্ষমতার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ পাই, কবির ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের ধারা ব্যাখ্যানে। বিভেদের মধ্যে ঐক্য—ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের এই মূলতত্ত্বটি কবি খুঁজে পেয়েছিলেন ঐতিহাসিক গবেষক-সুলভ পুঁথি-কেতাবের বিদ্যার ব্যায়ামের মধ্যে দিয়ে নয়, বলা যেতে পারে তৃতীয় নয়নের ধ্যানদৃষ্টিপ্রসূত আর্ষবীক্ষণ দ্বারা। বলাই বাহুল্য, প্রক্রিয়াটি অ্যানালিটিক্যাল নয়, সিনথেটিক ; খুঁটিনাটি পরায়ণ নয়, ইম্‌প্রেসানিষ্টিক্।

বঙ্কিমের বিদ্যাচর্চার পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। বাংলা পুরাতন নব্যন্যায়ী পণ্ডিতদের মত কুশাগ্রতীক্ষ্ণ তাঁর মন, ক্ষুরধার তাঁর বিশ্লেষণ, তাঁর চিন্তা যুক্তির পরম্পরায় শৃঙ্খলিত, প্রবন্ধের বক্তব্য বিস্তারে তিনি

রবীন্দ্রনাথের মত উপমা-উৎপেক্ষার প্রয়োগ সামান্যই করেন কিন্তু যুক্তি দেখান পদে পদে। তাঁর বাক্যসমূহের গঠন তর্ক বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী বিন্যস্ত, অনুমানক্ষমতা বা কাল্পনিকতার ভূমিকা সেখানে নেই বললেই চলে কিংবা অনুপস্থিত (যদিও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আরেক রূপ, সেখানে তিনি সৌন্দর্যের ডালি দু হাতে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন উপন্যাসের চরিত্র ও পরিবেশ সৃষ্টির অপ্রতিরোধ্য শৈল্পিক প্রয়োজনে)। বঙ্কিমের স্বভাবত যুক্তিবাদী নৈয়ায়িক মন পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-সাহিত্যের র‍্যাশানালিষ্টিক ধারার সঙ্গে মিল ও বেন্থামের উপযোগবাদ, কোঁতের ধ্রুববাদ, রুশো-ভলতেয়ারের সমাজ বিদ্রোহের বাণী, প্রুধোঁ-সেণ্ট-সাইমন-লুই ব্লাঁক-ফুরিয়ার-আওয়েন প্রমুখের কাল্পনিক সাম্যতন্ত্র বা ইউটোপিয়ান সোস্যালিজমের চিন্তা—ঐ সমস্তরই প্রণালীবদ্ধ চর্চা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।এমনকি মার্কস-এঙ্গেলসের কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর মূল কথাগুলিও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না বঙ্কিম রচনাবলী থেকে এমন আভ্যন্তর প্রমাণ উৎকলন করা যেতে পারে।

তার অর্থ, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কালের সবচাইতে জীবন্ত আর সব চাইতে সমসাময়িকতা-মনস্ক লেখক ছিলেন। ইউরোপের তৎকালীন আধুনিক জ্ঞান পর্যন্ত তাঁর মনোযোগের বলয়-সীমার অন্তর্গত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চিন্তার অগ্রগতির তত্ত্বে আস্থাশীল ছিলেন এবং রেনেশাঁস আদর্শের যেটা অন্যতম মুখ্য লক্ষণ—প্রাচীন জ্ঞান ও আধুনিক জ্ঞানের সামঞ্জস্য—তার কার্যকর দৃষ্টান্তস্থল ছিলেন। একদিকে যেমন তিনি সাংখ্য-বেদান্তের চর্চা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি ইউরোপের তদানীন্তন হালফিল চিন্তাটিরও খোঁজ-খবর রেখেছেন—কিছুই তাঁর সর্বগ্রাসী জিজ্ঞাসার ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে পারে নি। বঙ্কিমচন্দ্র আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে মার্ক্সীয় বিজ্ঞানেরও প্রণালীবদ্ধ চর্চা করতেন, কেন না বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই 'ডাস ক্যাপিটাল' প্রথম খণ্ডের প্রকাশ (১৮৬৭)। ডাস-ক্যাপিটাল দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে ও তৃতীয় খণ্ড ১৮৯৪ সালে। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৮৯৪ সালে। যিনি তাঁর মধ্য

বয়সের সবচেয়ে আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তা প্রুঁধোবাদ-সিণ্ডিক্যালিজম-ফুরিয়ারিজম প্রভৃতির চর্চা করেছেন, তিনি তাঁর পরিণত বয়সের আধুনিকতম পাশ্চাত্য চিন্তা মার্ক্সবাদকে চিন্তাচর্চার গণ্ডীর বাইরে রাখতেন একথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। একসময় না এক সময় তিনি এই দিকে আকৃষ্ট হতেনই, তবে সেই মতবাদ গ্রহণ করতেন কিনা সেটা আলাদা প্রশ্ন।

বোধহয় করতেন না, কারণ শেষের দিকে যে রকম আদাজল খেয়ে তিনি হিন্দুধর্মশাস্ত্রের চর্চায় লেগেছিলেন আর হিন্দু পৌরাণিক ধর্মের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য র‍্যাশানালিজমের 'পাঞ্চ' ঘটিয়ে নয়া হিন্দুত্বের বনিয়াদ খাড়া করবার চেষ্টা করছিলেন, তাতে এ সম্ভাবনা দূরপরাহত ছিল বলেই মনে হয়। বঙ্গদর্শনের কালে এটা সম্ভব হলেও হতে পারতো কিন্তু যখন থেকে তিনি 'প্রচার' আর 'নবজীবন' পত্রিকার হিন্দু সংস্কারবাদের আওতার মধ্যে আপনাকে জেনেশুনে সঁপে দিলেন এবং গীতোক্ত কৃষ্ণ-চরিত্রকেই মনুষ্যজীবনের পরিপূর্ণতার আধার বলে প্রচার করতে লাগলেন, তখন আর ওই দিকে সম্ভাবনা বিশেষ ছিল বলে মনে হয় না। বঙ্কিম ১৮৭৯ সালে 'সাম্য' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। চমৎকার একখানি গ্রন্থ এবং তার পাঠযোগ্যতা তথা সময়োপযোগিতা আজও সমান অব্যাহত আছে। কিন্তু এমনই বঙ্গীয় পাঠকদের কপাল যে, ওই উপাদেয় গ্রন্থ-খানির প্রচার বঙ্কিম শেষের দিকে বন্ধ করে দেন এবং পাঠকদের মধ্যে প্রবল চাহিদা সত্ত্বেও তার আর পুনর্মুদ্রণ করেন নি। হেতু? না, নয়া হিন্দুয়ানির প্রতি পক্ষপাতিত্বের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্রের নাকি মনে হয়েছিল ওই গ্রন্থে পরিব্যক্ত অনেক মতই ভুল!

উত্তর-জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার এই পশ্চাৎমুখীনতার কারণ নির্ণয় করার চেষ্টা আমরা পরে করব, আপাতত বক্তব্য এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা ভাষার লেখকদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি যাঁর রচনাবলীর মধ্যে অসামান্য সৃষ্টিকুশলতা আর তীক্ষ্ণধার মনীষার সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। বঙ্কিমের এই সমন্বয়ের আদর্শ আমরা গ্রহণ করতে পারিনি, পারলে

বাংলা সাহিত্যের চেহারা আজ ভিন্নরকম হতো, হতো অনেক বেশী যুক্তিনিষ্ঠ অনেক বেশী বৈদগ্ধ্যমণ্ডিত অনেক বেশী যাথাযথ্যের সংস্কার-যুক্ত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচনাদর্শকে ভুল বোঝার ফলে কতকটা, এবং কতকটা আমাদের নিজেদের কপাল দোষে, আমরা সৃষ্টির ক্ষেত্রে দৈবানুগ্রহ আর সহজ-পটুত্বের ধারণার উপর অতিরিক্ত নির্ভর করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আজ বর্তমান হতদশায় এনে ফেলেছি। সাহিত্য সৃষ্টিতে অনুশীলন আর মননের যে একটা মস্ত বড় ভূমিকা রয়েছে তা যেন আর আমাদের চেতনার মধ্যে ধরা দিতে চাইছে না, সেই ভূমিকাকে স্বীকার করা তো আরও পরের কথা। আমরা এমন সব ঔপন্যাসিক আর গল্পকারকে মাথায় করে রাখবার আবেগ অনুভব করি বৈদগ্ধ্য আর মনন-শীলতার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্কের চেয়েও দূরতর সম্পর্ক। এমন সব কবি আমাদের প্রশংসার শিরোপা পান, যাঁদের কল্পনা আত্ম-কেন্দ্রিকতার নৈরাজ্যের গহ্বর থেকে এলোমেলো ভাবে উদ্ভূত ও বস্তুনিষ্ঠ মননের দ্বারা সম্পূর্ণ অস্পৃষ্ট। ফলে প্রকাশ পায় অবিন্যস্ত ভাষা, অপরিচ্ছন্ন আঙ্গিক। বঙ্কিম-প্রবর্তিত মননশীলতার ঐতিহ্য যদি আমরা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতুম তো এমন হতো না।

আমি বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মানসিক গঠনের তুলনামূলক আলো-চনায় বঙ্কিমের মননভঙ্গীকে বিশ্লেষণাত্মক ও রবীন্দ্র-মননভঙ্গীকে সংশ্লেষণা-ত্মক আখ্যা দিয়েছি। বিরোধাভাসযুক্ত এই দুই বিপরীত প্রবণতার মধ্যেই দুইয়ের শক্তি ও দুর্বলতার তত্ত্ব নিহিত আছে। যে রবীন্দ্রনাথ প্রণালীবদ্ধ ইতিহাস ও দর্শনের চর্চা করেননি বলে আক্ষেপ জানিয়েছি এবং বক্তব্য প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে ও সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠায় ন্যায়শাস্ত্র-অনু-মোদিত যুক্তির পথ অনুসরণের বদলে ধ্যানসিদ্ধ কল্পনা ও অনুমানের 'পরেই বেশী নির্ভর করেছেন বলে ইঙ্গিত করেছি, সেই রবীন্দ্রনাথই কিন্তু দেখা যায় ওই শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করে পরিণত জীবনের প্রান্তে বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে অনেক, অনেক বেশী সার্থকতার তীরে সমুত্তীর্ণ হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার গতি প্রথাবদ্ধতা থেকে প্রগতির দিকে, পুনরুজ্জীবনবাদী রিভাইভ্যালিস্ট মনোভাব থেকে সাম্যতন্ত্রের দিকে, সনাতন ভারতীয় তথাকথিত তপোবন সভ্যতার জয়কীর্তন মুখরিত সঙ্কীর্ণ-জাতীয়তার ভূমি থেকে সর্বসংস্কারমুক্ত আন্তর্জাতিকতার আদর্শের অভিমুখে ক্রমিক উত্তরণের দিকে—এককথায় রবীন্দ্র-মনোজীবনের বিবর্তনে প্রগতির টানটাই সব সময়ে মুখ্য সচেতকের কাজ করেছে এবং এক দুর্নিবার ঊর্ধ্বগতির অভিকর্ষে তাঁকে ধাপে ধাপে উচ্চতর উপলব্ধি ও বিশ্বাসের সোপানে সমারূঢ় করে চূড়ান্ত সার্থকতার শীর্ষে উত্তীর্ণ করে দেবার চেষ্টা করেছে। শেষ বয়সের রবীন্দ্রনাথ সমস্ত প্রচলিত সংস্কারের বন্ধনমুক্ত রবীন্দ্রনাথ, এমনকি সেই সময়ে আবাল্যের অভ্যস্ত উপনিষদীয় ব্রহ্মবাদের সংস্কারও সম্ভবত তাঁর মনোজীবন থেকে ঝরে যাবার উপক্রম হয়েছিল—এমনি এক মোহমুক্তির কিনারায় এসে তিনি পৌঁছেছিলেন।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বেলায় ঘটেছিল সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার। তাঁর নব্যন্যায়ীসুলভ কুশাগ্র বুদ্ধি আর ক্ষুরধার মনীষা কোন কাজেই লাগল না, শেষ পর্যন্ত তাঁকে হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শ্রেণীস্বার্থের একজন উৎসাহী প্রবক্তা, হিন্দুসমাজের এক রক্ষণশীল সমাজপিতা এবং নয়া-হিন্দুয়ানীর এক প্রচণ্ডবিক্রমী উকিলে রূপান্তরিত করে ছাড়ল। নইলে এ কথা কে কবে ভাবতে পেরেছিল যে, যে-বঙ্কিমচন্দ্র এদেশে মিল-বেন্থামের উপযোগবাদের মধ্যে নিহিত আধা-সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও নারীমুক্তির ধ্যানধারণার প্রচারে অক্লান্ত-লেখনী ছিলেন, যিনি কোঁতের ধ্রুববাদ বা প্রত্যক্ষবাদের অন্তর্নিহিত নাস্তিক্যবুদ্ধি-কর্ষিত সার্বিক মানব-কল্যাণের মূল্যবোধ প্রচারে শ্রান্তিহীন ছিলেন; যিনি ডারউইন, হাক্সলি আর হার্বার্ট স্পেন্সারের বিবর্তনতত্ত্বের ছাঁচে বাংলায় জড়বাদী বিজ্ঞানে আস্থাসূচক একাধিক বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ রচনা করেছেন, যিনি তৎকালীন সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারার প্রভাবে সাম্য গ্রন্থ রচনা করেছেন ও চাষী-পরাণ-মণ্ডলের অর্থনৈতিক শোষণ ও অত্যাচারের নির্মম বাস্তব সত্যকে লোক-চক্ষে তুলে ধরার তাগিদ অনুভব করেছেন, এঁকেছেন কমলাকান্তের দপ্তর

আর লোকরহস্যের শ্লেষ-ব্যঙ্গ-রসায়িত অপূর্ব সব সমাজচিত্র, লিখেছেন রামধন পোদ আর মুচিরাম গুড়ের মতো সাধারণ মানুষের জীবনচরিত; সেই প্রগতিচঞ্চল দুর্দান্ত মনস্বী-লেখকই কিনা শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াপন্থী-নিম্নমুখী চিন্তার অভিকর্ষের চাপে তথাকথিত ধর্মতত্ত্ব আর দেবতত্ত্বের আবর্তের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেলেন, ভাটপাড়ার কুলীন বামুনের নামাবলী গায়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টাসমূহের বিরোধিতা করলেন, তুললেন সাম্প্রদায়িকতার জিগির; তথাকথিত অনুশীলন তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য লিখলেন ত্রয়ী উপন্যাস—'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরানী' ও 'সীতারাম'। দেবীচৌধুরানীর মোদ্দা কথাটা কী? স্বামী যতই ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ আর ব্যক্তিত্ববিহীন পুরুষ হোক, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীসেবাই হিন্দুনারীর একমাত্র আচরণীয় আদর্শ এবং শক্তিময়ী সাহসিকা দেবী-রূপিণীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশের বদলে স-সতীন স্বামীর সংসাররূপ খোঁড়লে ঢুকে সনাতন গেরস্থালীতে শক্তিক্ষয় করাটাই হিন্দুনারীর একমাত্র নিয়তিনির্দিষ্ট ভূমিকা। সমাজের স্থিতি আর স্থায়িত্বের জন্যই নাকি এটা আবশ্যক। চমৎকার এই অনুশীলন-তত্ত্বের মহিমা, যা সমাজের অনুশাসনকে ব্যক্তির চেয়ে বড় করে দেখায়, মানবতাকে কৃত্রিম নীতিবোধের খড়্গে খণ্ডিত করে, অর্থনৈতিক বৈষম্যের নিষ্করুণ বাস্তব সত্যকে ধর্মতত্ত্বের কুয়াশায় ঢাকবার চেষ্টা করে।

মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্রের বেলায় কেন এমনটা হলো? এমন তো হবার কথা ছিল না। কোথায় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও বেশী সংস্কার-মুক্ত, আরও বেশী প্রগতিশীল, আরও বেশী বৈপ্লবিক হবেন, তা নয়, সন্ত্রস্ত হয়ে লক্ষ্য করা গেল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তিনি ক্রমেই প্রগতির ভূমি থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন আর ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে প্রতিক্রিয়ার পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করছেন। চোখ-ধাঁধানো পাশ্চাত্ত্য শাস্ত্রবচনের গালভরা বুকনি আর ধর্মতত্ত্বের উচ্চনাদী বিভ্রান্তির আবরণ সরালে দেখা যাবে, শেষ বয়সের বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আসলে একজন নৈয়ায়িক কুলীন ব্রাহ্মণের অধিষ্ঠান হয়েছে যাঁর দেশ নৈহাটীর সন্নিকটস্থ

কাঁঠালপাড়ায়, সুতরাং যিনি গোত্র-সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়ার অচল দুর্গ বলে কথিত ভট্টপল্লীর আত্মীয়। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার একটি সাংঘাতিক সংস্কার, এ মরেও মরতে চায় না। যৌবনে ও প্রৌঢ় বয়সে যতই মিল-বেন্থাম-কোঁত আর ডারুইন-হাক্সলী কপচাও না কেন বৃদ্ধবয়সে একবার সমাজপতির ভূমিকায় সমাসীন হয়েছ কি, আর দেখতে হবে না, পূর্বার্জিত সমস্ত অগ্রসর-শিক্ষাদীক্ষার সংস্কার নস্যাৎ করে অবধারিত জয়ী হবে কৌলিক সংস্কার যা এতকাল নির্জ্ঞান মনের তলায় ঘুমিয়ে ছিল, এখন অনুকূল ক্ষেত্র পেয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বিশ্লেষণাত্মক মনীষার অনেক গুণ কিন্তু তার ভয়টা এখানে যে, তা কেবলই পরীক্ষণীয় বিষয়-বস্তুকে চিরে-ফেঁড়ে বিচার করে, কেটেকুটে তছনছ করে এবং কোন একটা সুস্থির সিদ্ধান্তের দিকে মনকে এগোতে দেয় না। তা বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, পাণ্ডিত্যের অভ্রভেদী উচ্চতার দ্বারা মনে মোহ সৃষ্টি করে, তার যুক্তির প্রখর শানে ঘৃষ্ট দ্যুতিময় চিন্তার ক্রম অনুসরণে পাঠকের একপ্রকার চমৎকার মানসিক পরিতৃপ্তি হয়, কিন্তু ওই পর্যন্ত। তা কোন স্থায়ী সিদ্ধান্তের কিনারায় পৌঁছুতে সাহায্য করে না। বঙ্কিম-মনীষার শক্তি এখানে যে তা অতিশয় ক্ষুরধার, প্রচণ্ডবিক্রমী, আগ্রাসী মনোভাবযুক্ত, যুক্তিক্রমের শৃঙ্খলায় সুবিন্যস্ত, কিন্তু দুর্বলতা এখানে যে, তা তার প্রবল বিক্রমের দ্বারা নিজেই নিজেকে ক্ষয় করে এবং কোন একটা পরিণামে পৌঁছুবার পথে স্বেচ্ছাকৃত বাধার সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের মত সংশ্লেষণাত্মক প্রতিভার অধিকারী হলে বঙ্কিমের মনীষার এই পরিণতি ঘটতো না।

২

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ-গ্রন্থাবলীর একটা মোটা অংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ-সন্দর্ভের সংকলন মাত্র। এই শ্রেণীতে পড়ে 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্ত' (কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের পত্র ও কমলাকান্তের জবানবন্দী), 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'বিবিধ প্রবন্ধ', (১ম ও ২য় খণ্ড—দ্বিতীয় খণ্ডের কিছু প্রবন্ধ 'প্রচার' পত্রিকা থেকে

সংকলিত) প্রভৃতি। এরপর তাঁর আরও প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—যেমন 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব', 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা', 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' প্রভৃতি। কিন্তু এই সব বই বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধের সংগ্রহ নয়, বেশীর ভাগই 'প্রচার' ও 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর সংকলন। তার অর্থ, বঙ্কিমের চিন্তাচর্চার জীবনের দুটি সুস্পষ্ট অধ্যায়—একটি বঙ্গদর্শন-কেন্দ্রিক, অন্যটি প্রচার ও নবজীবন-কেন্দ্রিক। বঙ্গদর্শন তাঁর প্রগতিমুখী, যুক্তিবাদী, সাম্যতন্ত্রী মনের প্রতিনিধিস্বরূপ ; পক্ষান্তরে প্রচার ও নবজীবন এই দুই পত্রিকা বঙ্কিমের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা-চেতনাকে চিহ্নিত করে। এই দুই পর্বের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাসের এতই মৌলিক পার্থক্য যে, উত্তর জীবনের রচনায় বঙ্কিম-মানসের সহজাভ্যস্ত বুদ্ধির প্রদীপ্তি, প্রগাঢ় জ্ঞানবত্তা, ক্ষুরধার যুক্তির পালিশের অসংশয় সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়া গেলে বিশ্বাস করাই কঠিন হতো এই দুই পর্বের রচনা একই ব্যক্তির লেখনীপ্রসূত। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য তাঁর চিন্তার ঝোঁক বদলকে সমর্থন করেছেন এইভাবে যে, "আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছি—কে না করে ?······'বঙ্গদর্শনে' যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যতদূর প্রভেদ, এতদুভয়ে ততদূর প্রভেদ। মত পরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল," (সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের বিজ্ঞাপন, ১৮৯২)।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বঙ্কিম তাঁর নিজের জবানীতেই তাঁর মত পরিবর্তনের কথা স্বীকার করেছেন এবং এটাকে তাঁর বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল বলে বর্ণনা করেছেন। কোন কোন সমালোচকের বক্তব্যের মধ্যেও অনুরূপ মতের প্রতিধ্বনি দেখতে পাই। তাঁরা মনে করেন বঙ্গদর্শনের আমলে বঙ্কিমের মন বহির্মুখী ছিল কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থাদির সঙ্গে যখন থেকে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হতে লাগল এবং মন ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে উঠল, তারই ফল অনুশীলনতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব, শ্রীমদ্ভগবদগীতা প্রভৃতি গ্রন্থ।

অর্থাৎ এই বক্তব্যের মধ্যে বার্ধক্যের অনুকূলে পক্ষপাত প্রদর্শন করা হয়েছে। যৌবনে ও প্রৌঢ় বয়সে মানুষের মন সাধারণত বহির্মুখী থাকে ; বার্ধক্যে বয়োধর্মেরই নিয়মঅনুযায়ী, মন ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়। বিশেষত হিন্দু মাত্রেরই জীবনে দেখা যায় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ পারলৌকিক চিন্তা এসে মনকে অধিকার করে, শাস্ত্রচর্চার দিকে ঝোঁক যায়, সন্ধ্যাহ্নিক-স্তোত্র-প্রার্থনা, নামজপ-গঙ্গাস্নান ইত্যাদিতে এযাবৎ-অনাবিষ্কৃত বহুবিধ সুফলের সাক্ষাৎ মেলে। সর্বোপরি, মঠ-মিশনের সাধু-মোহান্ত-গুরুজী-মাতাজীরা এসে মনের উপর বলতে গেলে অবলীলায়িতভাবেই তাঁদের অধিকার বিস্তার করে বসেন। হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভায় নাম লেখাবারও এই বয়স। এটা অন্তর্মুখীনতার লক্ষণ হতে পারে কিন্তু সবসময়েই যে এই ক্ষেত্রে মনের বিবর্তন প্রগতি থেকে আরও প্রগতির অভিমুখে বিহিত হয় এমন কথা সত্যি নাও হতে পারে। বরং এইরূপ বললেই বোধ করি যথার্থ বর্ণনা করা হয় যে, এই জাতীয় অন্তর্মুখীনতার আবেশে মন প্রায়শ রক্ষণশীলতার বদ্ধজলায় আটকে যায়, মনের বাড় বন্ধ হয়ে যায়, কখনও কখনও মন সুস্পষ্টরূপেই প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। বহির্মুখী জ্ঞান অবশ্যই নিম্নস্তরের জ্ঞান এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। তা যদি হতো তো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রচার আর নবজীবন পত্রিকাদ্বয়েরই সঘন ডঙ্কা নিনাদ হতো, বঙ্গদর্শনের নাম কেউ মুখে আনতো না। কিন্তু হয়েছে ঠিক উল্টো। বঙ্গদর্শনের প্রশংসা মানুষের মুখে মুখে, পক্ষান্তরে গবেষণার প্রয়োজনে বিস্মৃতির তাক থেকে নামিয়ে ধুলো ঝেড়ে সাফ-সুতরো করে তবে প্রচার আর নবজীবন-এর পাতা খুলতে হয়।—

বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে বঙ্কিম ওই পত্রিকার পৃষ্ঠায় বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভাদি প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি সহজ ও সরল করে প্রচার করাই ছিল এই রচনাসমূহের উদ্দেশ্য। 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৭৯) তিনি লিখেছেন : "ভারতবর্ষীয়দিগকে বিজ্ঞানে যত্নশীল করিতে হইবে, ও তাঁহারা যত্ন করিতেছেন কিনা তাহা সর্বদা দেখিতে হইবে।" অধিকাংশ প্রবন্ধই তাঁর

লেখা, কোন কোনটি অন্য লেখকের লিখিত। স্বরচিত বিজ্ঞান-প্রবন্ধগুলিকে পরে তিনি 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫) নামে পুস্তকাকারে প্রচার করেন। এই সমস্ত প্রবন্ধের মর্মবস্তু অনুধাবন করলে বোঝা যাবে বঙ্কিম জন-সাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য জড়বিজ্ঞানের সত্যসকল প্রচারের জন্য কী পরিমাণ উন্মুখ ছিলেন। ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে বিজ্ঞানের সেবা ও সাধনা যে অত্যাবশ্যক এটা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন বলেই স্বয়ং কষ্টতর কষ্ট স্বীকার করে ইংরেজী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংকলন করে বাংলা ভাষায় সহজ সরল ভঙ্গীতে সেগুলি পরিবেশন করেছেন। এ দায় তিনি নিজে স্বীকার না করলেও পারতেন কিংবা অপরের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন। তিনি মূলত সাহিত্যসেবী এই অজুহাত তো তিনি দেখাতে যান নি। আজকালকার বেশীর ভাগ সাহিত্যসেবীই যেটা সদাসর্বদা দেখিয়ে থাকেন এবং সেই নজীরে তথাকথিত বিশুদ্ধ সাহিত্য সেবার কোটরে আত্মগোপন করে থাকেন। সুখের বিষয় এক্ষেত্রে তিনি একক দৃষ্টান্তস্থল হয়ে থাকেন নি, তাঁর ধারা পরে আরও কোন কোন বরেণ্য লেখক সার্থক ভাবে অনুসরণ করেছেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই ধারার তার পরে তেমন উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটলো না কেন? হিন্দু মনের বহুল-বিজ্ঞাপিত অন্তর্মুখীনতার কারণেই কি? কিংবা সাধারণ বাঙালীর মজ্জাগত বিজ্ঞান-বিমুখতা এর কারণ? ঠিক বলতে পারব না। তবে বঙ্কিমচন্দ্র যে নিজের হাতেই নিজের কৃতিত্বের সুফল অনেকাংশে ছেদন করেছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই। সত্তর দশকের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাকে আশী দশকের আত্যন্তিক ধর্মপ্রবণতার দ্বারা খণ্ডন করেছেন। একই লেখকের দুই ভিন্ন বিষয়ক রচনা থাকতে পারে না এমন কথা নয়, ভিন্ন ভিন্ন বয়সে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের রচনারই অনুশীলন করে থাকেন এবং সেগুলি সমান্তরাল ধারায় প্রবহমান চিন্তাস্রোত রূপে গৃহীতও হয়ে থাকে। কিন্তু যদি দেখা যায় এক বয়সের চিন্তাদর্শ অন্য বয়সের চিন্তাদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত

ও একে অপরের খণ্ডনকারী সেক্ষেত্রে একটিকে বর্জন করতেই হয়। পাঠকদের মধ্যে কে কোনটিকে বর্জন করবেন সেটা তাঁর নিজ নিজ রুচি ও প্রবণতার উপর নির্ভর করে—এ বিষয়ে ধরাবাঁধা কোন বিধি থাকতে পারে না।

বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় খণ্ডে 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামে একটি সুবিস্তৃত রচনা আছে। এর কিছু অংশ 'সাম্য' গ্রন্থেও সংকলিত হয়েছিল। এই দীর্ঘ প্রবন্ধে বাংলাদেশের অসহায় কৃষককুলের উপর জমিদারদের অত্যাচার ও শোষণের একটি মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধের সূচনা ভাগের অংশে বলা হয়েছে ঃ "অধিকাংশ টাকাটা ভূস্বামীরই হস্তে যায়। ভূমিতে অধিকাংশ কৃষকেরই অধিকার অস্থায়ী ; জমিদার ইচ্ছা করিলেই তাহাদের উঠাইতে পারেন। দখলের অধিকার অনেকস্থানেই অদ্যাপি আকাশকুসুম মাত্র। যেখানে আইন অনুসারে প্রজার অধিকার আছে, সেখানে কার্যে নাই। অধিকার থাক বা না থাক, জমিদার উঠিতে বলিলেই উঠিতে হয়। কয়জন প্রজা জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া ভিটায় থাকিতে পারে ?······কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জলে বাস করিবে কি প্রকারে ?" উপসংহার ভাগে আছে ঃ "জমিদারের ঘরে ধন আছে, তাহার একমাত্র কারণ যে, তাঁহারা ভূমির উৎপন্ন ভোগ করেন। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, প্রজারা সেই উৎপন্ন ভোগ করিত, সুতরাং সেই ধনটা তাহাদের হাতে থাকিত। সে বিষয়ে দেশের কোন ক্ষতি হইত না, কেবল দুই চারি ঘরে তাহা রাশীকৃত না হইয়া লক্ষ লক্ষ প্রজার ঘরে ছড়াইয়া পড়িত।······এখন বিবেচনা করা কর্তব্য, ধনের কোন্ অবস্থা দেশের পক্ষে ভাল, দুই এক স্থানে কাঁড়ি ভাল, না ঘরে ঘরে ছড়ান ভাল? পূর্বপণ্ডিতেরা (অর্থশাস্ত্রীরা) বলিয়াছেন যে, ধন গোময়ের মত, একস্থানে অধিক জমা হইলে দুর্গন্ধ এবং অনিষ্টকারক হয়, মাঠময় ছড়াইলে উর্বরতাজনক, সুতরাং মঙ্গলকারক হয়। সমাজতত্ত্ববিদেরাও এ তত্ত্বের আলোচনা করিয়া সেইরূপই স্থির করিয়াছেন। এবং তাঁহাদের অনুসন্ধানানুসারে ধনের সাধারণতাই সমাজোন্নতির লক্ষণ বলিয়া স্থির হইয়াছে

ইহাই ন্যায়সঙ্গত। পাঁচ সাত জন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে আর ছয়কোটি লোক অন্নাভাবে মারা পড়িবে ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কিছু কি সংসারে আছে ?"

অথচ ১৮৯২ সালে 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় খণ্ডের নতুন সংস্করণ প্রকাশের কালে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থমধ্যে 'বঙ্গদেশের কৃষক'।প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত করে তার ভূমিকায় লিখেছেন যে, এখনকার প্রজারা জমিদারদের দ্বারা তেমন উৎপীড়িত নয়। "জমিদারদের আর সেরূপ অত্যাচার নাই। নূতন আইনে তাঁহাদের ক্ষমতাও কমিয়া গিয়াছে। কৃষকদিগের অবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে। অনেক স্থলে এখন দেখা যায় প্রজাই অত্যাচারী, জমিদার দুর্বল।" তবু যে তিনি এই প্রবন্ধটিকে গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করছেন তার কারণ, এই প্রবন্ধের দ্বারা পঁচিশ বৎসর পূর্বে কৃষকদের যে অবস্থা ছিল তা জানা যায়। দ্বিতীয় কারণ, 'সাম্য' গ্রন্থের প্রচার ইদানীং বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তদন্তর্গত 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধ পুনঃপ্রকাশের "একটা উপলক্ষ্য সৃষ্টি হইয়াছে"।

পঁচিশ বৎসর পূর্বে কৃষকেরা অত্যাচারিত হতো, এখন তেমন হয় না—এ এক পরম আবিষ্কার বটে। "প্রজাই অত্যাচারী—জমিদার দুর্বল" এ আরও তাজ্জবের কথা। শ্রেণীস্বার্থ চেতনা যে 'অতিবড় ন্যায়দর্শী প্রবল মনস্বী ব্যক্তিকেও কীভাবে গ্রাস করে তার এক জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ এই উক্তি। আমরা তো দেখছি, পঁচিশ বছর কেন, তারপর আরও একশো বছর পার হয়ে গেছে, আজও বঙ্গীয় কৃষকের অবস্থার দৃষ্টিগ্রাহ্য উন্নতি কিছু হয়নি। জমিদারী ব্যবস্থা রদ হয়েছে ঠিক কিন্তু বেনামীর অত্যাচার, বর্গাদারী প্রথার শোষণ, খাজনা অনাদায়ে জমি থেকে উচ্ছেদ, অগণিত ভূমিহীনের নিঃস্ব দশা—এ সবের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি।

বঙ্কিমের যুক্তিবাদী মন সামাজিক সুবিচারের নীতিতে আস্থাশীল ও সমদর্শিতায় অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, তিনি নিজেও ছোটখাটো একজন জমিদার ছিলেন। জমিদার শ্রেণীর প্রতি তাঁর পক্ষপাত উপন্যাসগুলির চরিত্র-সৃষ্টিতে এতই স্পষ্ট যে, ন্যায় ও সম্যক্ দর্শনের

ঝোঁকে মাঝেমধ্যে পরাণ মণ্ডল আর হানিফ শেখের দুঃখদুর্দশার সত্যচিত্রণে উদ্বুদ্ধ হয়ে লেখনীকে সেই কার্যে নিয়োজিত করলেও তার দ্বারা জমিদার শ্রেণীর প্রতি বদ্ধমূল পক্ষপাতের গ্লানি মোচন হয় না। মোচন যে হয়নি তার প্রমাণ 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় খণ্ডে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের ওই মুখবন্ধটি। প্রগতি আর প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে, বিদ্রোহ আর রক্ষণশীলতার টানাপোড়েনের প্রশ্নে, বঙ্কিম-মানস বরাবরই বোধ হয় কতকটা দ্বিধাবিভক্ত ছিল। তাঁর দোলাচলচিত্ততার প্রমাণ 'সাম্য' গ্রন্থের প্রচার বিলুপ্ত করায়, বঙ্গদর্শন পত্রিকারও প্রকাশ বন্ধ করে দিয়ে প্রচার পত্রিকার শরণ নেওয়ায়, মিল-বেন্থাম-কোঁত-ডারুইন বরবাদ করে কৃষ্ণ-মহিমায় বিগলিত হওয়ায়, হিন্দুধর্মকে সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেয়তর ধর্মের মর্যাদা দেওয়ায় ("অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ; কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ"— ধর্মতত্ত্ব, অনুশীলন অধ্যায়। স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণার কতিপয় উৎসস্থলের মধ্যে একটার হদিস পাওয়া গেল।), সর্বপ্রকার প্রগতিমুখী সমাজ-সংস্কার চেষ্টার বিরোধিতায়, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার জিগির তোলায়, ইত্যাদি।

তাই বলছিলাম বঙ্কিমের দুর্ধর্ষ মেধা, নিশিতনিপাত মনস্বিতা, সুতীক্ষ্ণ পাণ্ডিত্য কিছুই শেষপর্যন্ত কোন কাজে লাগল না। তিনি বাংলার সাহিত্যাকাশে চিরকাল দেদীপ্যমান হয়ে থাকবেন—সে তাঁর অবিস্মরণীয় উপন্যাসাবলীর জন্য, অনবদ্য চরিত্রসৃষ্টির কৃতিত্বের জন্য, 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের অক্ষয় প্রেরণার জন্য; কিন্তু মনস্বিতার সুফলের দ্বারা বঙ্গীয় সমাজের স্থায়ী উপকার সাধনের কথা যদি ওঠে তা হলে বলতেই হয় যে, বাঙ্গালী সমাজকে সুস্পষ্ট অগ্রসর-পথের নির্দেশ তিনি দিয়ে যেতে পারেন নি, বরং শেষের দিকে তাঁর চিন্তা তাঁর স্বীকৃত বৈদগ্ধ্য আর উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও শ্রেণী-স্বার্থের চোরাবালিতে আটকে গিয়েছিল। শ্রেণীস্বার্থ-চেতনা তাঁর বেলায় নানারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে—কখনও হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থের রক্ষক রূপে কখনও ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের ধ্বজাবাহকরূপে, কখনও জমিদারী স্বার্থের প্রতিভূরূপে, কখনও হিন্দুধর্মের তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্বের উদ্গাতারূপে। হিতবাদ আর সমাজতন্ত্র-কর্ষিত মনের এমনতর পরিণামে দুঃখই হয়।

সর্বশেষে, আর একটিমাত্র প্রসঙ্গের আলোচনা করে প্রবন্ধের উপসংহার ঘটাব। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে মহাভারতোক্ত কৃষ্ণকে সর্বগুণাধার মানুষের মর্যাদা দিয়ে তাঁকে আদর্শ পুরুষ রূপে সমাজের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তিনি কৃষ্ণকে নরদেহধারী ভগবান বলেন নি, বলেন নি তিনি অবতার, যা বৈষ্ণবেরা বলে থাকেন ; বলেছেন কৃষ্ণের মধ্যে সকল বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছিল, তিনি আদর্শ মনুষ্য। "তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ পুণ্যময়, দয়াময়, ধর্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, ইত্যাদি"।এত করেও কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কীর্তিত কৃষ্ণচরিত্রকে নবহিন্দুত্বের ধারণায় পুষ্ট বাঙ্গালীসমাজকে দিয়ে গ্রহণ করাতে পারেন নি। বাঙালী রসের মূর্ত বিগ্রহ গোপীজনবল্লভ গোকুলচারী বংশীধারী কৃষ্ণকে তাদের হৃদয় সমর্পণ করেছে, মহাভারতোক্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নায়ক পার্থ-সারথি আর গীতার প্রবক্তা কৃষ্ণের প্রতি কখনও ভক্তিচর্চিত অনুরাগে বিগলিত হতে পারেনি, দূর থেকে দণ্ডবৎ হয়ে ওই মহামহিমার্ণবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেই ক্ষান্ত হয়েছে। যে কৃষ্ণ-চরিত্রে অলৌকিকতার রস নেই, নেই পার্থিব জৈবলীলার প্রতিচ্ছবি, বরং যাঁর ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনায় কর্তব্য-কঠোরতার ইঙ্গিত আছে পদে পদে, তেমন কৃষ্ণে মোহিত হতে পারেনি কর্তব্য-শ্লথস্বভাব, অলস, অতিপ্রাকৃতের ভক্ত সাধারণ বাঙালী। বঙ্কিমচন্দ্র কল্পকথায় ভরা পুরাবৃত্তের সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদের মিশেল ঘটিয়ে এমন এক কৃত্রিম আদর্শ সংস্থাপন করতে চেয়েছিলেন যা অসাধ্য সাধনের নামান্তর। বলা অনাবশ্যক, তিনি এই ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

এই ব্যর্থতার মূল বঙ্কিমচন্দ্রের নিজেরই মধ্যে নিহিত। তিনি পুরাণকেও মানবেন আবার পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদকেও ছাড়বেন না—এমনতর সমন্বয় চেষ্টার মধ্যে স্বতোবিরোধ স্পষ্ট। ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ প্রয়াসের ফলে ধর্মকেও পাওয়া যায় না পরন্তু বিজ্ঞানকেও হারাতে হয়।

□ জনমনে বন্দেমাতরমের প্রভাব □

স্বদেশপ্রেমের সঞ্জীবনী মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের শতবর্ষপূর্তির বৎসর ১৯৭৬ খ্রীঃ। গানটি ১৮৭৫ খ্রীঃ নাগাদ লেখা হয়েছিল ব'লে ইতিহাস-কারদের অনুমান। অনুমানের পিছনে যাকে বলে 'পাথুরে প্রমাণ' তার পোষকতা না থাকলেও আভ্যন্তর প্রমাণ থেকে এই অনুমান সমর্থিত হয়। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের স্রষ্টা অমর ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্র এবং নীলদর্পণ নাটকের প্রণেতা দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতচন্দ্র দু'জনেই এই অনুমানের পক্ষে লিখেগেছেন। পূর্ণচন্দ্রের ধারণা, ১৮৭৫ খ্রীঃ কোন এক সময় এই গানটি রচিত হয়েছিল এবং রচনাকাল 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রবন্ধমালার অন্তর্গত 'আমার দুর্গোৎসব' নামক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধের রচনাকালের অব্যবহিত পরে হওয়াই সম্ভব। কেননা দুটি রচনার ভিতর গদ্য-পদ্যের মাধ্যমগত মৌলিক পার্থক্য থাকলেও বিশেষ ভাবগত মিল আছে। 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে শক্তিস্বরূপিণী মাতৃমূর্তির যে ধ্যান অনুপম গদ্যভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের উচ্চারণে তা-ই কবিতায় ছন্দিত ও সুরে বন্দিত হয়েছে। দুইয়ের ভাবের পটটিতে আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্গদর্শন পত্রিকার পৃষ্ঠায় ১৮৭৫ খ্রীঃ ধারাবাহিকক্রমে প্রকাশিত হচ্ছিল, তাই থেকে আমার দুর্গোৎসব আর বন্দেমাতরমের ভিতর ভাবসূত্র প্রতিষ্ঠা করা সহজতর হয়েছে।

কিন্তু রচনার উপলক্ষ্যটি নাকি বড়ই সামান্য! প্রায় অবিশ্বাস্য বললেও চলে। পূর্ণচন্দ্রের 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' বইয়ের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, তাঁর দাদা এই গানটি আদিতে বঙ্গদর্শন পত্রিকার শূন্য পৃষ্ঠার পাদপূরণের অভিপ্রায়ে রচনা করেছিলেন। সাময়িক পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে যাঁদের ধারণা আছে তাঁরা নিশ্চয় জানেন যে, কোনও রচনার শেষ পৃষ্ঠার পাঠ্যবস্তু যদি অল্পেই শেষ হয়ে যায় তাহলে সেই পৃষ্ঠার

শূন্যস্থল পরিপূরণের জন্য সম্পাদক মশাইকে ক্ষুদ্র কবিতা বা সংক্ষিপ্ত গদ্যাংশ বা কোন উদ্ধৃতি হাতের কাছে সর্বদাই মজুত রাখতে হয়, যাতে অপূরণ অংশ পূরণ করতে কোন অসুবিধা না হয়। তেমন কোন আপাত-তুচ্ছ অভিপ্রায় থেকেই নাকি এই গানের জন্ম। বঙ্কিমচন্দ্র গানটি লিখে টেবিলের উপর চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। তারপর কি ঘটেছিল তা পূর্ণচন্দ্রের জবানীতেই শোনা যাক—

"ছাপাখানার পণ্ডিত মহাশয় পাতা পূরণের জন্য, এটি দেখিয়া মন্দ নয় বলিয়া কহিলে, সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কাগজখানি টেবিলের দেরাজের ভিতর রাখিয়া বলিলেন, 'উহা ভাল কি মন্দ, এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না, কিছুকাল পরে বুঝিবে—আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।"

বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রতিপন্ন হয়েছিল। কিন্তু তিনিও বোধ করি তখন এই গানের অন্তহীন সম্ভাবনার প্রকৃত ধারণা করে উঠতে পারেননি। সূচনাতে এই গানের যথার্থ মূল্যাবধারণ হয়নি, ইতিহাসের সরণী বেয়ে বাঙ্গলার জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলন যত এগিয়ে গেছে তত এই মন্ত্রতুল্য গানটিকে ঘিরে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বদেশ-প্রেম, সংগ্রামী চেতনা, শৌর্য-বীর্য-সাহস, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, আত্মোৎসর্গের কামনা ক্রমশ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। গানটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সেই ইতিহাসেরও আবার শীর্ষবিন্দু স্পৃষ্ট হয়েছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে—১৯০৫ খ্রীঃ সমেত তার আগের ও পরের বৎসরগুলিতে। এই বছর কয়টিতে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের কলি কণ্ঠে ধারণ করে কত কত বীর বাঙালী যুবক যে পুলিশের লাঠি ও গুলির মুখে অকুতোভয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে, আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে তবু হাতের মুঠোয় জোর করে চেপে-ধরা জাতীয় পতাকা হস্তচ্যুত করেনি, মৃত্যুঞ্জয়ী শৌর্যের অমিত আধার রূপে হাসতে হাসতে ফাঁসীর মঞ্চে গিয়ে আরোহণ করেছে তার সীমা-সংখ্যা নেই। বস্তুত, বন্দেমাতরম্ নিছক একটি গান নয়, নিছক একটি মাতৃস্তোত্র নয়, তার সঙ্গে বাঙ্গলার স্বদেশী যুগের গোটা

ইতিহাসের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক—তার স্বাধীনতা সংগ্রামের নিত্যপ্রেরণাস্থল এই অবিস্মরণীয় সঙ্গীত। আর শুধু বাঙ্গলার কথাই বা বলি কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের মুক্তিকামনা এই গানটিকে অবলম্বন ক'রে একদা শ্রেষ্ঠ আত্ম-প্রকাশের উপায় খুঁজে পেয়েছিল। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতকে বাদ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার কথা ভাবা যায় না।

গানটি রচিত হওয়ার সাত বৎসর পরে এটি 'আনন্দমঠ' (১৮৮২ খ্রীঃ) উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রথম সাধারণের গোচর হয়। আনন্দমঠের বিষয়বস্তু, পরিবেশ, চরিত্র-পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য—যেদিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন—গানটি উপন্যাসের আবহের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে খাপ খেয়ে গেছে। আনন্দমঠ উপন্যাস আর বন্দেমাতরম্ গান এই দুই-ই একে অপরের পরিপূরক—দুইয়ের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য বলা যায়। বন্দেমাতরম্ সন্তানদলের সন্ন্যাসীদের মাতৃমন্ত্র, সন্তানদের স্বদেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গের আকাঙ্ক্ষার নিত্য-উদ্দীপক প্রেরণা। উপন্যাসের অনুষঙ্গে, এক অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর অরণ্যানীসমাকুল এক নির্জন প্রান্তরের বিস্তারমধ্যে এই গানটি প্রথম গীত ও শ্রুত হয়। গায়ক সন্তানদলের অন্যতম সন্ন্যাসী ভবানন্দ, শ্রোতা মহেন্দ্র। আমরা আনন্দমঠ উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদের সংশ্লিষ্ট অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি—

"ভবানন্দ—আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন,—

বন্দে মাতরম্।
সুজলাম্ সুফলাম্ মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাম্ মাতরম্।

"মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না—সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মাতা কে? জিজ্ঞাসা করিল, 'মাতা কে?'

"উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গাইতে লাগিলেন—

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীম্ সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাম্ বরদাম্ মাতরম্।

"মহেন্দ্র বলিলেন, 'এ ত' দেশ, এ ত' মা নয়।'

"ভবানন্দ বলিলেন, 'আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা,—'

"তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, 'তবে আবার গাও।"

"ভবানন্দ আবার গাইলেন—বন্দে মাতরম্······।"

পরিষ্কার বোঝা যায় এ গান মাতৃস্তোত্র হলেও সাধারণ মাতৃস্তোত্র নয়। এ মৃত্তিকাময়ী জননীর স্তব নয়, চিন্ময়ী জননীর ধ্যান। কতকগুলি মাটির ঢেলা গাছপালা পাহাড়-পর্বত নদীনালা সাগর পাথারের সমাহারকে বাহ্যদৃষ্টিতে দেশজননী ব'লে অভিহিত করলেও যতক্ষণ না ওই মৃত্তিকা প্রস্তর তরুলতা জলসমষ্টির ভিতর চিৎশক্তির আবাহন করা হচ্ছে, ততক্ষণ তা যথার্থ স্বদেশজননীর ধ্যানমূর্তিতে অধিষ্ঠিত হতে পারে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে, বঙ্কিমচন্দ্র এই দৃষ্টিতেই স্বদেশজননীকে দেখেছিলেন এবং ওই দর্শনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই বন্দেমাতরম্ গানটি লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে অরবিন্দ ঘোষ (উত্তর জীবনে শ্রীঅরবিন্দ) এবং তাঁর বিপ্লবী সহযোগিবৃন্দ বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতধৃত মাতৃকামূর্তির ভিতর ওই চৈতন্যস্বরূপিণী মায়ের রূপটিকেই প্রত্যক্ষ করে তদ্ভাবে ভাবিত হয়ে তাঁদের বিপ্লব আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ বন্দেমাতরম্ গানটির দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তিনি এটিকে বঙ্কিমের শিল্পীসত্তা থেকে ক্রান্তদর্শী সত্তায় উত্তরিত হওয়ার মূল কারক ব'লে মনে করেন এবং এখান থেকেই তাঁর ঋষিত্বের পর্বের সূচনা হয়েছিল ব'লে ধারণা করেন। অরবিন্দের মতে আনন্দমঠের আগে পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের যে

রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে তা হ'ল তাঁর কবি স্বরূপ, শিল্পীস্বরূপ, কিন্তু আনন্দমঠের সময় থেকে যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হ'ল তা হ'ল তাঁর "দ্রষ্টা ও জাতি-সংগঠক" স্বরূপ। অরবিন্দ আনন্দমঠ উপন্যাস ও তদন্তর্গত বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উনিশ শতকের শেষের দিকে বড়োদায় থাকাকালে তাঁর প্রসিদ্ধ 'ভবানীমন্দির' সংগঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে আরব্ধ অগ্নিমন্ত্রশুদ্ধ বিপ্লব আন্দোলনের পদ্ধতি-প্রকরণ, ধারা-ধরনের মধ্যে ভবানীমন্দিরের আদর্শের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

অরবিন্দ বন্দেমাতরম্ গানের গদ্য ও পদ্য ইংরেজী অনুবাদ ক'রেই শুধু ক্ষান্ত হননি, তিনি এই নামেই তাঁর যুগান্তর দলের ইংরেজী দৈনিক পত্রিকার নামকরণ করেন এবং পত্রিকাটিকে বিপ্লবী ভাবপ্রচারের মুখ্য বাহনে পরিণত করেন। বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত অরবিন্দের লিখিত কিন্তু অস্বাক্ষরিত দু-তিনটি সম্পাদকীয় নিবন্ধের জন্যই অরবিন্দকে আলিপুর বোমার মামলায় জড়ানো হয়। তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয় এই অজুহাতে যে, ওই অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধগুলি তাঁর রচনা এবং সেগুলির ভিতর তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের প্ররোচনা যুগিয়েছেন, অর্থাৎ হিংসার প্রচার করেছেন। সকলেই জানেন যে, তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ (পরে দেশবন্ধু) এই মামলায় অরবিন্দের পক্ষে দাঁড়ান এবং তাঁর অপূর্ব বাগ্মিতার প্রভাবে ও সুযুক্তিজাল-বিস্তারের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত অরবিন্দকে অভিযোগমুক্ত করতে সমর্থ হন। অরবিন্দ কারাগার থেকে ছাড়া পান।

বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় (১৯০৭-০৮ খ্রীঃ) অরবিন্দ তাঁর অন্যতম সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন, রাক্ষস যদি দেশজননীর বুকের উপর চেপে ব'সে তাঁর রক্তপানে উদ্যত হয় তাহলে মাতৃভক্ত সন্তান মাত্রেরই কর্তব্য হ'ল রাক্ষসকে আক্রমণ ক'রে তার প্রাণ বধ করা। ইংরেজ সরকার এই কথাগুলির মধ্যে রাজদ্রোহের গন্ধ পেয়েছিলেন, শুধু তাই নয়, অস্ত্র-ধারণেরও প্ররোচনা আবিষ্কার করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন সুকৌশলে এই

অভিযোগের খণ্ডন করেন। যে সওয়ালের সাহায্যে চিত্তরঞ্জন এই কাজটি সুসম্পন্ন করেন তার ভিতর শুধু সুদক্ষ ব্যারিস্টারসুলভ ক্ষুরধার তর্কনৈপুণ্য-শক্তিরই পরিচয় ছিল না, ছিল কবিপ্রাণতারও পরিচয়। চিত্তরঞ্জন সরকারের অভিযোগ খণ্ডনে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের নিহিত ভাবব্যঞ্জনার দ্বারা চালিত হয়েছিলেন—দেশজননী যে কেবলমাত্র মৃত্তিকাময়ী মা-ই নন, চিন্ময়ী মাও বটেন, একজন সংবেদনশীল কবির কবিদৃষ্টির দ্বারা এই ভাবটিকে তাঁর সওয়ালের কেন্দ্রমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সম্পাদকীয়তে উল্লেখিত মা সত্যিকারের মা। মায়ের অপমান কোন সন্তানই সহ্য করতে পারে না, করা উচিত নয়। রাজ-দ্রোহের অভিযোগে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত অরবিন্দ দেশজননীর উপমায় সত্যিকার মায়ের দুঃখের কথাই লিখেছিলেন। তিনি মৃন্ময়ী মায়ের দেহে চিন্ময়ী সত্তার আরোপ করেছিলেন।

বন্দেমাতরম্ পত্রিকার অন্যতর এক সম্পাদকীয়তে অরবিন্দ লেখেন —"It was thirty-two years ago that Bankim wrote his great song...... The Mantra had been given and in a single day a whole people had been converted to the religion of patriotism. The Mother had revealed herself......A great nation which has had that vision can never again be placed under the feet of the conqueror." অর্থাৎ, বত্রিশ বছর আগে বঙ্কিম তাঁর মহান্ সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন।......মন্ত্র উচ্চারিত হল আর দেখতে দেখতে একটা গোটা জাতি দেশপ্রেমের ধর্মে দীক্ষিত হয়ে পড়ল। জননী আত্মপ্রকাশ করলেন।......যে বিরাট জাতির এমনতর ধ্যানদৃষ্টি খুলে গেছে, সেই জাতি আর কখনও বিজেতার পায়ের তলায় পড়ে থাকতে পারে না।

পড়ে থাকেওনি, এই ছত্রগুলি লিখিত হওয়ার ঠিক চল্লিশ বছর পরে ভারতবর্ষ ইংরেজের নাগপাশমুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে।

সর্বশেষে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত

সম্পর্কে কী লিখেছিলেন তা উৎকলন করে দিয়ে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের উপসংহার করছি—

"বঙ্কিমচন্দ্র যাহা কিছু করিয়াছেন···সব গিয়া এক পথে দাঁড়াইয়াছে। সে পথ জন্মভূমির উপাসনা—জন্মভূমিকে মা বলা—জন্মভূমিকে ভালবাসা—জন্মভূমিকে ভক্তি করা। তিনি এই যে কার্য করিয়াছেন, ইহা ভারতবর্ষের আর কেহ করেন নাই। সুতরাং তিনি আমাদের পূজ্য, তিনি আমাদের নমস্য, তিনি আমাদের আচার্য, তিনি আমাদের ঋষি, তিনি আমাদের মন্ত্রকৃৎ, তিনি আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা। সে মন্ত্র—বন্দেমাতরম্।"

বাংলার নবজাগৃতি

॥ ১ ॥

ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলার এক গৌরবময় যুগ। এ যুগে বাংলাদেশে জীবনের সর্বস্তরে এক নতুন প্রাণস্পন্দনের সঞ্চার হয়েছিল, জাতি যেন দীর্ঘদিনের ঘুমঘোর থেকে নতুন আলোকে চোখ মেলে তাকিয়েছিল। কি ধর্মক্ষেত্রে, কি শিক্ষায়, কি সমাজ-সংস্কারে, কি সাহিত্য ও সংস্কৃতি-কর্মে বাংলাদেশের সে এক অভিনব জীবন-চাঞ্চল্যময় রূপ! সতেরো ও আঠার শতকে বাংলার অগ্রগতি প্রায় সব দিক দিয়েই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল বলা চলে—এক ধরনের মানসিক জাড্য ও সংস্কারান্ধতা বাঙ্গালী সমাজকে ওই সময়ে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পর থেকে দেশের চেহারায় দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন ঘটল। ইংরেজী ভাবধারার অভিঘাতে গোড়াকার দিকে বাঙ্গালীর ভারসাম্য কিছুটা বিচলিত হলেও ধীরে ধীরে তার মধ্যে আত্মস্থতা এল—শিক্ষায় সংস্কৃতিতে ধর্মে বাঙ্গালীর মানসিকতায় এক দূর-প্রসারী নবচেতনার স্ফুরণ হল। এইটেকেই নবজাগৃতি বা নবজাগরণ বলে অভিহিত করা হয়, যার বিদেশী প্রতিশব্দ হল 'রেনেশাঁস'। বস্তুত রেনেশাঁসের বাচ্যার্থ থেকেই নবজাগৃতি কথাটি এসেছে। ইংলণ্ডে এ-জাতীয় রেনেশাঁস একবার দেখা দিয়েছিল রাণী এলিজাবেথের শাসন-কালে, তারপর আর একবার উনিশ শতকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসন আমলে। বাংলার উনিশ-শতকীয় নবজাগৃতি আন্দোলনের প্রকৃতি এই দুই রেনেশাঁস থেকে কিছু ভিন্ন, তা হলেও সর্বাত্মক জাতীয় জাগরণ যদি রেনেশাঁসের মৌলিক চারিত্রলক্ষণ হয় তো চেষ্টা করলে এই তিন ঘটনার মধ্যে বেশ কিছু মিলও আবিষ্কার করা যায়।

সব দেশেরই রেনেশাঁস বা নবজাগৃতি আন্দোলনের দুটি প্রধান

লক্ষণ হল : (১) অতীত মূল্যবোধসমূহের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোযোগ ও ঐতিহ্যের সাভিনিবেশ চর্চা ; এবং (২) অতীত অনুশীলনের ভিত্তিতে সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গী নিয়ে নানা নূতন নূতন কর্মের প্রবর্তনা। এই মানদণ্ড যদি আমরা বাংলাদেশের উনিশ-শতকীয় স্থিতিতে প্রয়োগ করি তাহলে দেখব, ওই সময়ের পরিবেশ সর্বাংশেই রেনেশাঁসের লক্ষণ দ্বারা ভূষিত হয়ে উঠেছিল।

প্রথমে ধর্মের কথাই বলা যাক। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ—উনিশ শতকের বাংলায় ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে এঁরাই হলেন দিক্‌পাল পুরুষ। দেখা যায়, এঁদের প্রত্যেকেরই সাধনায় কম বা বেশী পরিমাণে অতীত-চেতনা এবং নতুন জীবনবোধের সমন্বয় ঘটেছিল। এঁরা হয়তো কেউ নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন নি কিন্তু নিছক পুরাতন নিয়েও কেউ সন্তুষ্ট থাকেন নি। সনাতন হিন্দুধর্মের কাঠামোয় নানা অত্যাবশ্যক যুগোপ-যোগী সংস্কারসাধন করে এঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রতিভা ও প্রবণতা অনুযায়ী আচারবদ্ধ আর অনুশাসনসবস্ব ধর্মের ধারণায় নূতন গতিবেগের সঞ্চার করেছেন। গতানুগতিক ধর্মবোধের মধ্যে এনেছেন নবসৃষ্টির প্রেরণা। যে ক'জনার নাম করা হল এঁদের প্রত্যেকেই রেনেশাঁসের মানস-সন্তান—উনিশ-শতকীয় নবজাগৃতির ফসল। অপর-পক্ষে, শিক্ষায় ও সমাজসংস্কারে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রমুখের উদ্যমের মধ্যেও পাওয়া যায় এক সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়—ঐতিহ্যচেতনার পাশে পাশে যুক্তিবাদী আর মানবমুখী প্রগতিশীল মনোভাব। ইউরোপীয় র‍্যাশানেলিজমের সংস্কার তাঁদের চেষ্টায় আনে বিচারনিষ্ঠা, শাস্ত্র-বলেই-শাস্ত্রকে-মান্য-করবার মূঢ় আনু-গত্যের বন্ধনমুক্তি। সাহিত্যে ও কাব্যে রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, হেম, নবীন, বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে এযাবৎ অনাস্বাদিত এক নূতন ভাবের অবতারণা করলেন। ইংরেজ-অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী বাংলা

কাব্যে দেশাত্মবোধের উদ্দীপনা তেমন ছিল না, ছিল না বিষয়বস্তুতে জাতীয় ভাবের সংক্রাম। ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেম-নবীনের কাব্যে আর বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুগামী গদ্যলেখকদের রচনায় পাওয়া গেল জাতীয়তার মন্ত্রের অসংশয় উদ্‌ঘোষণ। মধুসূদন, বিহারীলাল আর রবীন্দ্রনাথ কাব্যে আনলেন গীতলতা বা 'লীরিসিজম্'-এর এক নতুন সুর, যার মূলে আছে ইউরোপীয় কাব্যধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় অথচ যা দেশজ সংস্কার থেকে মোটেই বিচ্যুত নয়। এভাবে যে ক্ষেত্রেই দৃষ্টিপাত করা যাক না কেন দেখা যাবে যে, বাংলার নবজাগৃতির মধ্যে দুই ভাবের সামঞ্জস্য ঘটেছে ঃ ঐতিহ্যপ্রীতি আর নবীনপ্রত্যয়, অতীতচেতনা আর ভবিষ্যৎবীক্ষা, প্রাচীন ধ্যানদৃষ্টি আর নূতন কর্মোদ্যম। ইউরোপীয় রেনেশাঁসের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যই প্রতিভাত দেখতে পাচ্ছি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলনের মধ্যে।

ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে রামমোহন প্রথম দিক্‌পাল ও এক বিরাট পুরুষ। দীর্ঘদিনের বিচারহীন শাস্ত্রবশ্যতার ফলে হিন্দু সমাজের মধ্যে বহু আবর্জনা জমেছিল—কুসংস্কারের পেষণে স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেচনার কণ্ঠরোধ হবার উপক্রম হয়েছিল। রামমোহন সেই পুঞ্জীভূত কুসংস্কার আর বিচারমূঢ়তার বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহের আকারে ঊনিশ শতকের প্রারম্ভভাগে আবির্ভূত হলেন বাংলার সমাজে। রামমোহন হিন্দু ইসলাম ও খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব—এই তিনের সঙ্গেই গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। এই ত্রয়ীজ্ঞানের ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে তিনি বেদান্ত-প্রতিবাদ্য সত্যধর্মের মহিমা প্রচার করলেন। উপনিষদের আত্মসমাহিত ধ্যানতন্ময়তা, কোরানের একেশ্বরবাদ এবং খৃষ্টীয় সাধকের ভক্তিব্যাকুলতা এক বিন্দুতে এসে মিলিত হল রামমোহনের সাধনার ধারার মধ্যে। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, যে বহুদেববাদ আর মূর্তিপূজাকে প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রধান লক্ষণ মনে করা হয় তা মোটেই হিন্দুধর্মের প্রধান লক্ষণ নয়—বস্তুতঃ এই বহুদেববাদ আর মূর্তিপূজার সংস্কার বেদের শিক্ষার বিরোধী। রামমোহন মুক্তির সাধক ছিলেন কিন্তু দেশ ও

সমাজের প্রতি মানুষের যে বহুবিধ দায়িত্ব আছে তাকে বাদ দিয়ে মুক্তির কথা তিনি বলেন নি। জীবনপ্রীতিরসে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল নিষিক্ত। তিনি ছিলেন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয়ের প্রতীকস্বরূপ "ভুক্তি-মুক্তি"র উদ্‌গাতা। অন্ধ শাস্ত্রশাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি যে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করলেন তারই সূত্র ধরে এল নতুন চেতনা যা আধুনিক ভারতের বুনিয়াদ। রামমোহনকে খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে রিফর্মেশান আন্দোলনের জনক, প্রটেস্ট্যাণ্ট মতের প্রবর্তক মার্টিন লুথারের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই দুই ধর্মনেতার ভিতর নানা বিষয়েই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রামমোহন কোনো নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নন, তিনি হিন্দুধর্মের একজন শক্তিশালী সংস্কারক। হিন্দু ধর্মেরই আওতায় বর্ধিত তাঁর প্রটেস্ট্যাণ্ট চার্চের নাম 'ব্রাহ্মধর্ম'।

দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনেরই যোগ্য শিষ্য ও অব্যবহিত উত্তরপুরুষ। রামমোহন ১৮২৮ সালে যে 'ব্রাহ্মসভা'র পত্তন করেন তাকেই পরবর্তীকালে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম-সমাজের আকার দান করেন দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামিবৃন্দ। ১৮৩৯ সালে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন আর তার চার বছর পর, পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের যাজকত্বে তিনি ও তাঁর কুড়িজন সমভাবাপন্ন বন্ধু ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বাংলায় সংস্কারপন্থী ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের সেই থেকে জয়যাত্রা শুরু।

দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে বেদের অপৌরুষেয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ যুক্তিবাদী মনীষী ব্রাহ্মদের প্রভাবে পরে ঐ মত পরিত্যাগ করেন এবং তার স্থলে "আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়কে" ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ শাস্ত্রশাসনের দাসত্ব ত্যাগ করে আত্মবিবেকের নির্দেশকেই ধর্মপথে চলার প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করলেন। তবে আত্মপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি হয়েও তিনি উপনিষদের ধ্রুবভূমি থেকে কখনও বিচ্যুত হননি।

ব্রাহ্মধর্মের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ছাড়াও দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে আর একটি বড় কাজ হয়েছিল। তৎকালীন 'ইয়ং বেঙ্গল'

আন্দোলনের অতিবৈপ্লবিকতায় বিভ্রান্ত হিন্দু যুবকদের একাংশের মধ্যে যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণের হিড়িক দেখা দিয়েছিল তার গতি মুখ্যতঃ দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় প্রতিরুদ্ধ হয়।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের শিষ্য ও সহকর্মী কিন্তু পরে জাতিভেদ, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি প্রশ্নে দেবেন্দ্রনাথ-চালিত ব্রাহ্মসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র শুদ্ধ ভক্তির আবেগে চালিত এক মহৎ অন্তঃকরণ ধর্মভাবুক, প্রার্থনার কার্যকারিতায় তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উপলব্ধিই ছিল তাঁর প্রধান কামনা। খৃষ্টীয় ত্রিত্ব-প্রত্যয় তিনি তাঁর সাধনার ধারায় প্রয়োগ করেছিলেন। কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে এসে গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং রামকৃষ্ণের ধর্মমতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বধর্মের সমন্বয়মূলক 'নববিধান' মতের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ছিলেন এই মতের একজন বিশিষ্ট প্রচারক। আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও ছিলেন কেশবচন্দ্রের অন্যতম সহযোগী। তিনি ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক রূপে কাজ করেন। কিন্তু পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসার পর তাঁর মনোভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটে, তিনি ব্রাহ্মমত পরিত্যাগ করে বৈষ্ণবধর্মের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্রের খৃষ্টীয় পক্ষপাত, ভাবাবেগের আতিশয্য, ব্রাহ্মমণ্ডলীতে কীর্তনের প্রবর্তন ও আরও কতিপয় ব্যাপারে প্রতিহত হয়ে তাঁর এককালীন সহযোগী শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্মনেতারা ১৮৭৮ সালে 'সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠা করেন।

সর্বশেষে রামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহত্ত্ব এতই অপ্রতিবাদ্য আর মতামত এতই সুপ্রচারিত যে, তাঁর ধর্মমত বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। উনিশ শতকের শেষ পাদে দেহরক্ষাকারী এই মহাসাধক যেন নিজ সাধনার ধারায় সকল ধর্মমতের স্রোত এনে মিলিয়ে ছিলেন। কলিকাতার অদূরস্থিত দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণ ভগবানকে নিজ জীবনে উপলব্ধি

করবার মানসে হিন্দু ঐশ্লামিক, খৃষ্টীয়, জরথুষ্টীয়—সকল প্রকার ধর্মীয় উপাসনা প্রণালীর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যান এবং পরিণামে সকল ধর্মই যে মূলতঃ এক এই সার সত্যে উপনীত হন। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, কোনো ধর্মই খণ্ড সত্যের প্রচারক নয়, সব ধর্মেই পূর্ণ সত্য নিহিত। "যত মত, তত পথ।"

অভয়মন্ত্রের উদ্‌গাতা, ভারতে সমাজতন্ত্রের প্রথম প্রচারক, নব-বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এই রামকৃষ্ণদেবেরই ভাবসন্তান ও যোগ্য-উত্তরসাধক। ১৮৯৩ সালে চিকাগোর ধর্ম মহাসম্মেলনে বিশ্ববিজয়ী বক্তৃতার পর তাঁর নাম পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। রামকৃষ্ণের ধর্মমতকে তিনি মানবসেবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ধর্মকে যুগোচিত সচলতা আর কর্মোদ্যমে পূর্ণ করে তোলেন। হিন্দুধর্মের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ধর্মপ্রচার করলেও সকল ধর্মের প্রতি বিবেকানন্দের সমান শ্রদ্ধা ছিল। ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শের তিনি পরম অনুরাগী ছিলেন। তিনি তাঁর এক মুসলমান বন্ধুকে পত্রে লেখেন: "হিন্দুধর্ম ও ইসলাম এই দুইয়ের সমন্বয় আমাদের মাতৃভূমির উজ্জীবনের একমাত্র আশা।"

শিক্ষা ও সমাজসংস্কার বাংলার উনিশ শতকের নবজাগরণের একটি প্রধান লক্ষণ বলা যেতে পারে। শিক্ষার বিস্তার, বিশেষ করে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার এবং সামাজিক নানা কুপ্রথা নিরোধের চেষ্টা এই পর্বের বাংলাদেশে সবিশেষ জোরদার হয়ে উঠেছিল। শিক্ষা বিস্তার প্রয়াস আর সমাজসংস্কার প্রয়াস এ দুটিকে যুক্তভাবে উপস্থাপিত করবার অর্থ এ দুয়ের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য যোগ বর্তমান। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কুপ্রথা আর কুসংস্কারের জড়ত্ব ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হতে থাকে এটা পরীক্ষিত সত্য। বস্তুতঃ বাংলার উনিশ শতকের নেতারা একথা ভালোভাবেই জানতেন যে, সামাজিক কোনো ক্ষতিকর প্রথার অবসান বা মঙ্গলকর কোনো নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হলে সবচাইতে যেটা বেশী দরকার তা স্কুল শিক্ষার উন্নয়ন। শিক্ষার যত বেশী অগ্রগতি হবে ততই আলোয় কুয়াশা মিলিয়ে যাবার মতো অজ্ঞতা মূঢ়তা আর

কুসংস্কারও ক্রমশঃ দূরীভূত হতে থাকবে। এই সত্য বিধিমতে জানা ছিল বলেই দেখা যায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ উনিশ শতকের প্রথম দিককার সমাজনেতারা সমাজ-সংস্কারের বাহনরূপে শিক্ষাকে একটি প্রধান মর্যাদার স্থান দিয়েছিলেন। শিক্ষার নিজস্ব মূল্য তো আছেই, তাছাড়া সমাজসংস্কারের হাতিয়াররূপেও তার মূল্য বড় কম নয়। ফলে উনিশ শতকের নবজাগৃতি আন্দোলনে শিক্ষা আর সমাজসংস্কার একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ হয়ে উঠেছিল বলা চলে।

উনিশ শতকের শিক্ষাক্ষেত্রে গোড়াকার যুগে শ্রীরামপুর মিশনের পাদরিগণ, রামমোহন, ডেভিড হেয়ার, রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, তারিণীচরণ মিত্র, বিদ্যাসাগর, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্র, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। শ্রীরামপুর মিশনের কেরী ও মার্শম্যান একই সঙ্গে সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক কুপ্রথা নিরোধের আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তনে, বাংলা গদ্যের প্রাথমিক মূর্তি-নির্মাণে, বাংলা ভাষায় সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও কোষগ্রন্থের ঐতিহ্য-সৃষ্টিতে এই দুই মহাত্মা খৃষ্টীয় পাদরীর দানের কোনো তুলনা হয় না। এদেশে খৃষ্টধর্মের প্রচার এঁদের অবচেতন মনে সূক্ষ্ম ইচ্ছা রূপে কাজ করলেও সেই ইচ্ছাকে ছাপিয়ে তাঁদের কাজের সুফলটাই বাঙালী সমাজে বড় হয়ে উঠেছিল। নবজাগরণের প্রথম পর্যায়ে একাধিক ক্ষেত্রে পথিকৃতের দায়িত্ব পালন করে কেরী ও মার্শম্যান বাঙালী জাতিকে তাঁদের নিকট অশেষ ঋণে আবদ্ধ করে গেছেন।

১৮১৭ সালে বাংলায় দুটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়, যার ফল শিক্ষা-প্রসারের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। তার একটি হল কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা, অন্যটি হিন্দু কলেজের পত্তন। স্কুল বুক সোসাইটি ইউরোপীয় ও এদেশীয় অনেক বিশিষ্ট জনের সমবায়ে গঠিত হয়েছিল, যাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সুলভ মূল্যে ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষা-

গুলিতে স্কুল পাঠ্যগ্রন্থের প্রণয়ন ও প্রচার। হিন্দু কলেজ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য সৃষ্ট হয়েছিল। রামমোহন হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করলেও প্রত্যক্ষভাবে তাঁর নাম এই চেষ্টার সঙ্গে জড়িত ছিল না। এই ব্যাপারে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন মহামতি ডেভিড হেয়ার। রামমোহন ইংরেজী শিক্ষার সবিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং কলিকাতায় ও মফঃস্বলে একাধিক ইংরেজী স্কুলের প্রবর্তন করেন।

একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মত যে, সমাজ সংস্কারের প্রশ্নে রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে তৎকালীন হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেবের যতই মত পার্থক্য থাকুক, ইংরেজী শিক্ষার বাঞ্ছনীয়তার প্রশ্নে তাঁদের ভিতর কোনই বিরোধ ছিল না। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি এবং হিন্দু কলেজের গভর্নিং বডি এই দুয়েতেই রাধাকান্ত ছিলেন একজন সক্রিয় সদস্য। স্ত্রী-শিক্ষারও তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী সমর্থক।

রামমোহন, অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্র, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা স্ত্রীশিক্ষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এ ব্যাপারে সবচেয়ে উদ্যোগীর ভূমিকা নেন বিদ্যাসাগর। তিনি সরকারী আনুকূল্যে ও কখনও কখনও নিজ ব্যয়ে কলকাতায় ও মফঃস্বল অঞ্চলে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগরের চেষ্টা অক্ষুণ্ণ ছিল। কলকাতা শহরে আজ যা বেথুন স্কুল ও কলেজ নামে পরিচিত তার এককালে নাম ছিল হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়। স্ত্রীশিক্ষার এক প্রধান উৎসাহী ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেবের চেষ্টায় ১৮৪৯ সালের মে মাসে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের পরিচালনায় বিদ্যাসাগর ছিলেন বেথুন সাহেবের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ। অন্যান্য সহযোগীর মধ্যে ছিলেন রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। বিদ্যাসাগর ছিলেন স্কুলের প্রথম সম্পাদক।

বয়স্ক শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা এবং শ্রমিক শ্রেণীর জনগণের জন্য শিক্ষা—এই ত্রিবিধ ক্ষেত্রেই কেশবচন্দ্রের অবদান স্মরণীয়। কারিগরী শিক্ষার জন্য তিনিই প্রথম এদেশে 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল' এবং শ্রমজীবীদের মানসিক বিকাশের জন্য নৈশ বিদ্যালয়ের পত্তন করেন। এ ভিন্ন নারীশিক্ষার জন্য স্থাপন করেন নর্মাল স্কুল। জনশিক্ষার সুবিধার্থে নাইট স্কুল প্রতিষ্ঠা ছাড়াও কেশবচন্দ্র আরও একটি কাজ করেন—তিনি 'সুলভ সমাচার' নামে একটি সহজবোধ্য পত্রিকার প্রচার করেন যার মূল্য ছিল মাত্র এক পয়সা। কেশবচন্দ্রের এইসব নানামুখী উদ্যমের মধ্য দিয়ে তাঁর অভিনবত্ব-প্রয়াসী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রীজাতির জাগরণ আর স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক কালে ব্রাহ্মসমাজের আওতার মধ্যে আর যাঁদের চেষ্টায় এই কাজের সহায়তা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট হলেন শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, শিবচন্দ্র দেব, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও উমেশচন্দ্র দত্ত।

এবারে সমাজসংস্কারের কথা। বাংলা দেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ভাগ বা তার কিছু বেশী সময়কে সমাজসংস্কার চেষ্টার এক অখণ্ড ইতিবৃত্ত বলা যায়। গঙ্গাসাগরে শিশুসন্তান নিক্ষেপ বন্ধের প্রয়াসে এই ইতিহাসের শুরু, বিধবাবিবাহের প্রবর্তন আর বহুবিবাহ নিরোধ চেষ্টায় ওই ইতিহাসের সাময়িক পরিসমাপ্তি। উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে আর সমাজসংস্কারের তেমন নজির দেখতে পাওয়া যায় না, তবে শতাব্দীর একেবারে শেষ পাদে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে আবার সমাজ-সংস্কারের কম্বু ঘোষণা শুনতে পাওয়া গেল। বিবেকানন্দ বিশেষভাবে কোনো কুপ্রথার নিরোধের কথা বলেননি, সাধারণভাবেই দেশবাসীর সামাজিক সম্বিৎ জাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। তবে মূঢ় জাতিভেদ প্রথা ও জাতীয় জড়তার উপর তাঁর ধিক্কার বাক্য তীব্রভাবে নেমে এসেছিল।

সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন্য রামমোহনের নিরলস চেষ্টার ইতিহাস সুবিদিত। যে-কোনো সংস্কারের কাজেই রামমোহন জনমতকে প্রবুদ্ধ করার চেষ্টা করতেন এবং আইনের সাহায্য ব্যতিরেকেই যাতে জনমতের

চাপে বাঞ্ছিত সংস্কার সাধিত হয় তাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। এই কারণে দেখা যায় সতীদাহ নিরোধের ব্যাপারে তিনি মুখ্যতঃ প্রচারের উপর জোঁর দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর এই সম্পর্কিত বিভিন্ন রচনায় যুক্তিপ্রয়োগে দেখিয়ে দিলেন যে, সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা হিন্দু সমাজের একটি মূঢ় দেশাচার মাত্র, তার পিছনে শাস্ত্রবাক্যের কোনো সমর্থন নেই। ধর্মের নাম করে এই নিষ্ঠুর প্রথা অবলা নারী সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। রামমোহনের বলিষ্ঠ আন্দোলনের পশ্চাতে সমাজের প্রগতিশীল অংশের নেতৃবৃন্দ সঙ্ঘবদ্ধভাবে এসে দাঁড়ালেন। এদিকে তাঁর বিরোধিতায় জোটবদ্ধ হলেন গোঁড়া হিন্দু নেতারা, যাঁদের চোখে যে কোনোরূপ পরিবর্তনই, তা যতই কাম্য হোক, অনাচারের সামিল। এভাবে সতীদাহ বর্জন বা রক্ষণের প্রশ্নে হিন্দুসমাজ দুটি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ হয়ে গেল।

অবশ্য এ ক্ষেত্রে রামমোহনই যে প্রথম চেষ্টা করেছিলেন তা নয়। এর আগেও সতীদাহ নিরোধের জন্য বিভিন্ন সময়ে সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোম্পানীর সরকার এদেশীয় লোকাচারে হস্তক্ষেপের ফলে জনমত বিক্ষুব্ধ হবে আশঙ্কায় সতীদাহ বন্ধ বাঞ্ছিত জেনেও হাত গুটিয়ে ছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ, লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড মিণ্টো, লর্ড হেস্টিংস, লর্ড আমহার্ষ্ট—এই পাঁচজন গভর্ণর-জেনারেলের শাসন আমলে চেষ্টা করেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। অবশেষে লর্ড বেন্টিঙ্ক শাসনক্ষমতায় আসার পর অবস্থার মোড় ফিরল। তিনি ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর তারিখে সরকারী এক ডিক্রী বলে সতীদাহ “অবৈধ ও আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ” বলে ঘোষণা করলেন। রামমোহনের এতদিনের চেষ্টা জয়যুক্ত হল।

কিন্তু রক্ষণশীল নেতারা থেমে থাকেননি। তাঁরা সরকারী ডিক্রীর বিরুদ্ধে বিলেতে প্রিভি কাউন্সিলে দরবার করলেন। কিন্তু প্রিভি কাউন্সিল তাঁদের দাবী নাকচ করে দিলেন। আইনগত বিধানবলে হিন্দু সমাজের কলঙ্কস্বরূপ দীর্ঘদিনের একটি অমানবিক প্রথার উচ্ছেদ হল।

এইস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, রামমোহনের সতীদাহ নিরোধ আন্দোলন পরিচালনাকালে কেরী সাহেব ও ডিরোজিও-চালিত 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায় সংহত আকারে ওই আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

এর পর যে অন্দোলনের প্রভাবে সারা বাংলা দেশ আলোড়িত হয়ে উঠেছিল তা হল বিদ্যাসাগর-চালিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলন। সতীদাহের আন্দোলনের বেলায় যেমন, তেমনি এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেও বাংলাদেশ দুটি দলে ভাগ হয়ে গেল—বিধবাবিবাহের সমর্থক দল আর বিধবাবিবাহের বিরোধী দল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ বসু, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য "ডিরোজিয়ানগণ" ছিলেন বিধবাবিবাহের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ; অন্যপক্ষে রাজা রাধাকান্ত দেবের দল তার ঘোরতর বিরোধী। স্বভাবতঃই রক্ষণশীলেরা সংখ্যায় ভারী ছিলেন, কিন্তু কোনো প্রতিকূলতাই অমিততেজা বিদ্যাসাগরের অদম্য মনোবলে চিড় ধরাতে পারেনি। তাঁকে প্রাণের ভয় দেখানো হয়েছিল কিন্তু তাতেও তিনি অচল অটল ছিলেন। বিদ্যাসাগর ও তাঁর সমর্থকদের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিধবাবিবাহ আইনবদ্ধ হল। বালবিধবাদের উপর দীর্ঘদিনের আচরিত অন্যায়ের প্রতিবিধানের পথ প্রশস্ত হল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ প্রবর্তন চেষ্টা ছাড়াও বহুবিবাহ নিরোধ, কৌলীন্যপ্রথার অত্যাচার দমন প্রভৃতি অন্যান্য সৎ চেষ্টায়ও নিয়োজিত হয়েছিলেন। বর্ধমানের মহারাজা শেষোক্ত দুটি সংস্কারের কাজে তাঁর বিশেষ সহায় হয়েছিলেন। মদ্যপান নিরোধ ওই সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার-প্রচেষ্টা। এতে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন প্যারীচরণ সরকার, প্যারীচাঁদ মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

॥ ২ ॥

বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে যে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল তার একটি প্রধান অঙ্গ হল সাহিত্য। বস্তুতঃ ওই শতাব্দীর বাংলা

সাহিত্যে এক অভাবনীয় প্রাণচাঞ্চল্যের সূচনা হয় এবং পুরাতন দিনের সাহিত্য থেকে নতুন দিনের সাহিত্যের পার্থক্য স্পষ্টীকৃত হয়ে ওঠে। পার্থক্যের মূল প্রেরণা এসেছিল ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরে। ইংরেজ এদেশে আসার পর তাদের সাহিত্য ও সভ্যতার মূল্যবোধ ক্রমশঃ তৎকালীন বাঙালী শিক্ষিত জনমনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, ফলে বাংলা সাহিত্যের ধ্যানধারণায় আমূল রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তরের বৈশিষ্ট্য নিরূপণই বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য।

মধ্যযুগ এবং ইংরেজ অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগের বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় সেই যুগের সাহিত্যের মূল প্রেরণা ছিল ধর্ম, দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণন, নানাবিধ অলৌকিক সংঘটনের সম্ভাব্যতায় আস্থাশীলতা, সাহিত্যকে ধর্মপ্রচারের বাহনরূপে ব্যবহার—এসব ছিল মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি মূল ভাব। এটা বাংলা সাহিত্যের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নয়, সকল দেশের মধ্যযুগীয় সাহিত্যেই ধর্মের প্রভাব কমবেশী লক্ষ্য করা যায়। তবে বাংলায় বৈষ্ণবীয় ভাববন্যার ফলে প্রায় একটানা তিনশো বছর ধরে সাহিত্য ও ধর্ম অঙ্গাঙ্গী হয়ে গিয়েছিল বলা চলে। ইহমুখীনতা বা মানবিকতার সুর তেমন করে বাংলা কাব্যে—কাব্যই বলব, কারণ তখনও বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ হয়নি—অনুরণিত হতে পারেনি। এর একমাত্র ব্যতিক্রম মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের কাব্য। মধ্যযুগের এই দুই কবির কাব্যে স্পষ্টতঃই ভিন্ন রসের আস্বাদন মেলে। মুকুন্দরামে পাই মানবিকতা, ভারতচন্দ্রে পাই ইহমুখীনতা। এ দুটি গুণই পরে উনিশ শতকের বাংলা কাব্যে ভূরি পরিমাণে বর্তিয়েছিল। তবে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে জাতীয়তার অর্থাৎ একজাতিত্বের সঞ্জীবনী চেতনার তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এটা একান্তভাবেই উনিশ শতকের নবজাগৃতির দান। ইংরজী সাহিত্যের ভাবধারার সঙ্গে সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছিল। দেশপ্রেম বা দেশাত্মিকাবুদ্ধি হল এই নবোদভিন্ন ভাবের ভিত্তি।

মধ্যযুগের বিলয় ও আধুনিক যুগের উদয়ের সন্ধি লগ্নে আবির্ভূত ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় আমরা প্রথম এই নতুন সুরের আভাস পেলাম। "বিদেশের ঠাকুর ফেলে দেশের কুকুরকে পূজা করার" যে মনোভাব তাঁর কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে তা একান্তভাবেই বাংলা কাব্যে একটি নতুন ভাবের সংযোজন। গুপ্ত কবিরই শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পরে এই ভাবটিকে আরও সম্প্রসারিত করেন। তাঁর কণ্ঠেই কম্বুনিনাদ শুনতে পাওয়া যায়—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়। দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়।" রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) কাব্যেও স্বদেশপ্রেমের উদাত্ত বাণী ধ্বনিত হয়েছিল।

ঈশ্বর গুপ্ত আর রঙ্গলাল ছাড়া পরে আর যে সকল লেখকের রচনায় স্বদেশপ্রেমের সবিশেষ উজ্জীবন ঘটে তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন ঃ কাব্যে মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ এবং গদ্য সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুগামী লেখকবৃন্দ।

কিন্তু জাতীয়তাই শুধু উনিশ শতকের সাহিত্যের একমাত্র ভাববস্তু নয়, আরও অনেক দিক দিয়ে পূর্বযুগের সাহিত্য থেকে এই যুগের সাহিত্যের পার্থক্য সূচিত হয়েছিল। সকল দেশেই রেনেশাঁসের খাত বেয়ে আসা আধুনিক সাহিত্যের যেটা প্রধান লক্ষণ তা হল মানবতন্ত্র। এই মানবতন্ত্রের জয়ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় উনিশ শতকের বাংলা কাব্যে। মানবতন্ত্রের হাত ধরে এসেছিল ইহমুখীনতা ও জীবনপ্রীতি। "এ জীবন অসার ; শুধু পারত্রিক পুণ্যের সঞ্চয়ই একমাত্র করণীয়"—এই ধারণা ক্ষয় হয়ে গিয়ে তার জায়গায় দেখা দিল রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শময় পারিপার্শ্বিকের প্রতি সজাগ চেতনা এবং মানুষের প্রতি প্রীতি। মানুষকে জগতের কেন্দ্রমূলে স্থাপন করবার আদর্শ প্রতিষ্ঠা পেল।

নতুন যুগের এই সব ধ্যান ও ধারণা সবচাইতে সার্থক শিল্প রূপ পেল মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। এই দুই শক্তিমান কবির কাব্য মানবিকতার সুরে ভরপূর। মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্য মেঘনাদবধের ছত্রে ছত্রে

উদ্‌গীত হয়েছে কল্পিত ও অতিরঞ্জিত দেবমহিমার ঊর্ধ্বে পাপপুণ্যমণ্ডিত মানুষের মনুষ্যত্বের জয়মাহাত্ম্য ; শত্রুর আক্রমণের মুখে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জন্মভূমিকে যে-কোনো মূল্যে রক্ষা করবার দুর্জয় সংকল্প। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কাব্যে পাই মর্ত্য প্রীতির অসংশয় ঘোষণা : "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।" কিংবা, "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।" —এ সবই বাংলা কাব্যে নতুন সুরের যোজনা। নিসর্গ চেতনা, জীবনপ্রীতি, মানবপ্রেম, দেশাত্মিকা বুদ্ধি, আশাবাদ, ঔদার্য—এর প্রতিটি লক্ষণই রেনেশাঁসী সাহিত্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। বাংলার নবজাগরণের যুগের সাহিত্যের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

অন্যপক্ষে নবজাগরণের অপর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যুক্তিনিষ্ঠা, যুক্তিবাদের সবল অনুশীলন। যুক্তিবাদের মূলে আছে প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর বিশ্বাস এবং অতিপ্রাকৃতবাদে বিশ্বাসের শৈথিল্য কিংবা অবলোপ। উনিশ শতকের বাঙালী লেখকদের মনোভঙ্গীতে যুক্তিবাদের সবিশেষ প্রণোদনা লক্ষ্য করা যায় এবং যেহেতু কাব্য অপেক্ষা গদ্যের সরণী যুক্তি-চর্চার পক্ষে অধিক প্রশস্ত, সেই কারণে স্বভাবতঃই গদ্যলেখকদের মধ্যেই যুক্তির চর্চা বেশী হয়েছে। উইলিয়ম কেরী, মার্শম্যান, ফেলিক্স কেরী প্রমুখ শ্রীরামপুর মিশনের গদ্যলেখকদের রচনাবলী এবং রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ মুখ্যতঃ গদ্যলেখকদের সৃষ্ট সাহিত্য একথার প্রমাণ বহন করছে।

এ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ লেখক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বস্তুতঃপক্ষে অসাধারণ মনস্বী লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের মানসগঠনই হল যুক্তিপন্থী এক বৈজ্ঞানিকের, যা আরও বেশী মজবুত হয়েছিল ইউরোপীয় প্রত্যক্ষবাদ, উপযোগবাদ প্রভৃতি মূলতঃ যুক্তিপন্থী দর্শনের চর্চায়। যদিও সেই সঙ্গে এ কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র শুধুমাত্র একজন যুক্তিবাদী

লেখকই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ সৃজনী প্রতিভামণ্ডিত শিল্পী। উপন্যাসে তিনি সৌন্দর্যস্রষ্টা, প্রবন্ধে তিনি যুক্তিবাদী মেজাজের লেখক। তবে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে তাঁর যুক্তিবাদ সব সময় ভারসাম্য রক্ষা করে চলেনি বলেই আমাদের বিশ্বাস। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সংস্কার যদি যুক্তিবাদের মূল কথা হয় তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন এই কয়জনাকে এই শ্রেণীর রচনার প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক বলে গণ্য করতে হয়—অক্ষয়কুমার, ভূদেব ও রাজেন্দ্রলাল। অবশ্য তাঁদের প্রদর্শিত পথে পরবর্তীকালে অনুগামীর সংখ্যা খুব বেশী দেখা যায়নি।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলার উনিশ শতকে নবজাগৃতির সব-চেয়ে সার্থক প্রতিনিধি যদি কেউ থেকে থাকেন তো তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। রবীন্দ্রনাথ যদিও উনিশ শতকে জন্মেছিলেন তা হলেও তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রাচুর্যময় ও সবচাইতে সৃষ্টিশীল অংশ পড়েছিল বিশ শতকে, সেই কারণে সামগ্রিক বিচারে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের শীর্ষাধিপতি হলেও, উনিশ শতকের পরিপ্রেক্ষিতে, নবজাগৃতির লক্ষণ বিচারে, প্রথমের গৌরব মধুসূদনকেই দিতে হয়। সংজ্ঞার্থে মধুসূদনই হলেন বাংলার প্রথম আধুনিক কবি। তিনি বাংলা কাব্যের প্রচলিত মূল্যবোধের আমূল রূপান্তর সাধন করেছিলেন। কাব্যের ভাববস্তুতেই শুধু তিনি বিপ্লব আনলেন না, আঙ্গিক বা রচনাশৈলীতেও বিপ্লব আনলেন। তিনি রামায়ণ কাহিনীর পুরাতন-প্রচলিত ধারণার সম্পূর্ণ মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। রাবণ ও তার পুত্র মেঘনাদ নায়কোচিত মহিমায় ভাস্বর, স্বদেশ রক্ষার্থে আত্মোৎসর্গকারী বীর; পক্ষান্তরে রাম ও তার অনুচরবৃন্দকে তিনি "ঘৃণা" করেন। ইউরোপের কাব্যসংস্কারে ঘনিষ্ঠভাবে লালিত তাঁর মন রামায়ণের গোটা ধারণাটাকেই এইভাবে পাল্টে দিল।

এদিকে কাব্যের শৈলীতে ঘটালেন তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বাংলা কাব্যের আঁটোসাঁটো ঋজুকঠিন পয়ার ছন্দের বন্ধনমুক্তি ঘটিয়ে তাতে আনলেন প্রবহমানতার স্বাচ্ছন্দ্য—বাংলা ভাষার ললিতকোমল ছন্দের

ধ্বনিতে শুনতে পাওয়া গেল মিল্টনীয় 'ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের' ওজঃগুণমণ্ডিত উদাত্ত নিঃস্বন।

আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে অভিনবত্বের অবতারণা করে মধুসূদন পথিকৃতের মর্যাদা লাভ করলেন। তিনি বাংলায় প্রথম বিয়োগান্ত নাটকের রচয়িতা, প্রথম প্রহসনের রচয়িতা, প্রথম সনেটের রচয়িতা। তা ছাড়া মূলতঃ ক্লাসিক ছন্দোবন্ধের কাব্য রচয়িতা হলেও মধুসূদন তাঁর কাব্যে রোমান্টিক স্বাদ গন্ধও বড় কম আনেন নি। তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' তো রোমান্টিক গীতিকাব্যের মধুস্বাদে ভরপুর। মধুসূদনের প্রবর্তিত রোমান্টিক রীতির পরে আরও সম্প্রসারণ ঘটান বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় বড়াল প্রমুখ মুখ্যতঃ গীতিকবিগণ। আর তাঁর ওজঃধর্মী বীরত্বব্যঞ্জক স্বদেশপ্রেমের ভাবোদ্দীপক কাব্যরীতির উত্তরসাধক হলেন হেমচন্দ্র ও নবীন সেন। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' আর নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' শৌর্যবীর্যের আদর্শের ধারাবাহী দুটি সুলিখিত কাব্য। অবশ্য এই ধারার কাব্যের পরে আর তেমন অনুশীলন হয়নি; উনিশ শতকের শেষপাদ আর বিশ শতকের কিঞ্চিদধিক সার্ধ-দুই পাদের কাব্যরচনার স্রোত প্রধানতঃ গীতিকবিতার খাতেই প্রবাহিত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দী বাংলা গদ্যের বিকাশের কাল। এই ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের লেখকদের দান অমূল্য। কেরী, মার্শম্যান প্রমুখের কথা আগেই বলেছি। তাঁরা ছাড়া আর যাঁদের দানে বাংলা গদ্যের প্রাথমিক রূপের সৌষ্ঠব সাধিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রামমোহন, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসরূপে নির্দেশিত হয়। কারও কারও মতে প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম উপন্যাস। সম্প্রতি 'ফুলমণি ও করুণা' গ্রন্থটির উপর এই গৌরব আরোপ করা

হচ্ছে। চলতি রীতির গদ্যের প্রথম বই হল কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'।

গদ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রেরও ঐতিহ্য সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশঃ এই বিভাগের পরিপুষ্টি হতে থাকে। 'সমাচার দর্পণ' 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' 'সম্বাদ কৌমুদী' 'সমাচার চন্দ্রিকা' 'সম্বাদ প্রভাকর' 'জ্ঞানান্বেষণ' 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' 'সুলভ সমাচার' 'মাসিক পত্রিকা' 'সোমপ্রকাশ' এবং সর্বশেষে 'বঙ্গদর্শন' এই যুগের কয়েকটি সমধিক পরিচিত সাময়িক পত্রিকা।

নাট্যরচনার ক্ষেত্রে এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হল দীনবন্ধু মিত্রের যুগান্তকারী নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০)। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত কববার অভিপ্রায়ে নাটকটি রচিত হয়েছিল। নীলদর্পণের আগে ও পরে একাধিক নাটক রচিত হয়েছে, কিন্তু কোনটিই তার মত নয়। কি ভাবের বলিষ্ঠতায়, কি বাস্তবতার বিচারে, কি চরিত্র সৃষ্টির ও সংলাপের স্বাভাবিকতায় 'নীলদর্পণ' বাংলা নাট্য সাহিত্যে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে রয়েছে।

□ বাংলা সাহিত্যে যুক্তিবাদের ধারা □

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ওই সাহিত্যে অষ্টাদশ শতকে লেখকদের চিন্তা ও মনোভঙ্গীতে একটা বড় রকমের পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। সেই পরিবর্তন আবেগাতিশয্য থেকে পরিমিতির অভিমুখে, উচ্ছ্বাস থেকে স্থিরতার অভিমুখে, বল্গাহীন প্রকাশরীতি থেকে সংযমশাসিত প্রকাশের অভিমুখে। এককথায়, হৃদয়বৃত্তির বদলে বুদ্ধি-বৃত্তির, ভাবাবেগের বদলে যুক্তির আদর্শ এই কালে সাহিত্যের সর্বাধিক-মান্য আদর্শ রূপে গৃহীত হয়েছিল। শুধু যে গদ্য সাহিত্যে এই আদর্শের জয়জয়কার দেখতে পাই তা নয়, কাব্যরীতিতেও তার প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল। পূর্ববর্তী এলিজাবেথীয় যুগের কবিরা রোমান্টিক উদ্বেলতার আধিক্য বশতঃ ভাবাবেগের স্বাধীনতার আনন্দের চূড়ান্ত করে ছেড়েছিলেন। তার প্রতিক্রিয়ায় সপ্তদশ শতাব্দীতে কাব্যে ও গদ্য সাহিতে একটা বিপরীতমুখী টান লাগে—দেখা দেয় সাহিত্যের রূপ ও রীতিতে ক্লাসিক আদর্শের পুনরুজ্জীবন। তৎকালীন ইংলণ্ডের রাজনৈতিক স্থিতি এই পরিবর্তনকে আরও ত্বরান্বিত করে। গৃহযুদ্ধ, প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ, ক্রমোয়েলীয় সাধারণতন্ত্রের প্রবর্তন প্রভৃতি যুগান্তকারী ঘটনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যেও একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তনের সূচনা হয়। কবিই হোন আর গদ্যশিল্পীই হোন, লেখকেরা আর হৃদয়বৃত্তির আতিশয্যে বিশ্বাস করেন না, বরং তাকে কতকটা সন্দেহের চোখে দেখেন। ভাবের পরিমিত, পরিচ্ছন্ন খুঁতহীন প্রকাশ তাঁদের আদর্শ। উদ্বেলতা তাঁদের কাছে একটা বর্জনীয় বস্তু।

এই নূতন ভাবেরই শ্রেষ্ঠ ফসল হলেন কাব্যে জন মিলটন (১৬০৮—৭৪) এবং জন ড্রাইডেন (১৬৩১—১৭০০) এবং গদ্যে সার টমাস ব্রাউন (১৬০৫—৮২)। সতেরো শতকের এঁরাই হলেন

সাহিত্যের গতিনির্ণায়ক তিন প্রধান পুরুষ। নিও-ক্লাসিসিজমের ধারক ও বাহক।

আঠারো শতকে এই প্রক্রিয়া আরও বেশী জোরদার হলো। ইতোমধ্যে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ক্রমোয়েলীয় প্রোটেক্টরেট শাসনের অবসান হয়ে রেষ্টোরেশন বা রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের রক্তপাতহীন বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। তাতে সাহিত্যের রূপ ও রীতির উপরও যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। একটা দেশের রাষ্ট্রিক-সামাজিক ঘটনাবলী সে দেশের সাহিত্যকে প্রভাবিত না করেই পারে না। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। আঠারো শতকের ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিক ভাবধারার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়ে দেখা দেয় 'এজ অব রিজন' বা 'যুক্তির যুগ'। কি কাব্যে কি গদ্যে আঠারো শতকীয় ইংলণ্ডীয় লেখকদের যুক্তিবাদই প্রধান উপাস্য হয়ে ওঠে। নতুন এই আন্দোলনের স্রোতমুখে যে সব কবি ও গদ্যলেখক উদ্‌গত হন তাঁদের মধ্যে মুখ্য হলেন—উইলিয়াম কনগ্রীভ, আলেকজাণ্ডার পোপ, স্যামুয়েল বাটলার (কবি) ; এবং জন বুনিয়ান, স্যামুয়েল পেপিস, সুইফট, অ্যাডিসন, স্টীল ও ড্যানিয়েল ডিফো (গদ্যলেখক)।

এঁরা সকলেই হলেন আঠারো শতকের প্রথমার্ধের লেখক। দ্বিতীয়ার্ধে যাঁরা এলেন তাঁরাও সকলে কমবেশী যুক্তিবাদের ধারক তবে তাঁদের রচনায় পূর্বযুগের ঋজুতা অনেক কমে এসেছে এবং পরবর্তী কালের 'রোমান্টিক রিভাইভালের' অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের এইরূপ কয়েকজন প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকের নাম—কলিনস, গ্রে, উইলিয়ম কাউপার, বার্ণস (সকলেই কবি) ; রিচার্ডসন ও ফিল্‌ডিং (ঔপন্যাসিক) ; এবং ডক্টর জনসন, গোল্‌ডস্মিথ, গিবন, বার্ক (গদ্যলেখক) প্রমুখ।

বাংলা সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের গৌরচন্দ্রিকা অকারণে ফাঁদা হয়নি। এটা দেখানো এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য যে, চেষ্টা করলে আমাদের সাহিত্যেও এ-জাতীয় একটা 'এজ অব রিজন'

আবিষ্কার করা যায়। তবে সেটা অষ্টাদশ শতকে নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে। বস্তুতঃ, আমাদের সাহিত্যে আঠারো শতকে নতুন কোন সাহিত্যরীতি উদ্ভাবিত হওয়ার কোন কথাই ওঠে না, কেননা সেই যুগটা ছিল বিলীয়মান মধ্যযুগের কোটরে নিমজ্জিত এবং তখনও মঙ্গলকাব্যের বিজৃম্ভন চলছে। সুগঠিত বাংলা গদ্যের তখনও জন্ম হয়নি। প্রকৃতপক্ষে আমরা যাকে আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলি তার উদয় হয়েছে এদেশে ইংরেজ অভ্যাগমের পরে এবং ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলে। সত্যি বলতে, উনিশ শতক থেকেই এই সাহিত্যের সূত্রপাত। গদ্যে রামমোহন-বিদ্যাসাগর এর পথিকৃৎ, কাব্যে ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলাল এর প্রথম তন্ত্রধারক। তারপর একে একে অন্যান্য দিক্‌পালদের উদয় হয়েছে।

বাংলা ভাষায় উনিশ শতকের একটা বিস্তৃত ভাগ জুড়ে আমরা ক্লাসিক রীতি তথা যুক্তিপন্থী চিন্তাদর্শের বিশেষ প্রভাব দেখতে পাই। আধুনিক সাহিত্যের সূচনার সঙ্গে এই দুই আদর্শ চমৎকার মিশে গিয়েছিল এবং তার ফলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রারম্ভিক পর্বে খুবই আশাপ্রদ লক্ষণের সঞ্চার হয়েছিল। দুঃখের বিষয় পরবর্তী কালে এই যুগ্ম আদর্শের সুফল আমরা ধরে রাখতে পারিনি। ক্রমে ক্রমে আমাদের সাহিত্য থেকে যুক্তিবাদের সংস্কার তিরোহিত হয়েছে এবং তার জায়গায় বাংলার স্বভাবসিদ্ধ গীতলতা (লিরিসিজম) র দীর্ঘকালগত পুরাতন সংস্কার পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের প্রথম পাদ থেকে যে র্যাশানেলিটির শুভ সূচনা হয়েছিল তার সুফল ক্রম-ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এক সময়ে হারিয়ে গিয়েছে।

আমরা এক্ষণে এই র্যাশানেলিটি প্রধান বহির্মুখ ধারার সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এবং তার প্রধান প্রধান প্রতিনিধিদের কৃতির পরিচয় নেবার চেষ্টা করব। তার আগে উনিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলা দেশের সামাজিক স্থিতির একটা হিসাব নেওয়া যাক।

বাংলার গোটা মধ্যযুগটাই ছিল তিমিরান্ধতায় আচ্ছন্ন এবং দেব-

দেবীর দৈবী মহিমা এবং অলৌকিকতার কুসংস্কারে ভরা। ধর্ম ছিল বাংলা সাহিত্যের মূল উপজীব্য এবং সে ধর্মও লৌকিক ধর্ম, বিচারহীন ভক্তিব্যাকুলতার দ্বারা আগাগোড়া অনুলিপ্ত। এর মধ্যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং বৈষ্ণব ধর্মের স্ফুরণ ধর্মের ক্ষেত্রে একটা রেনেশাঁসের সূচনা করেছিল বটে কিন্তু ষোড়শ শতক থেকে আঠারো শতক এই কমবেশী তিনশো বছরের কালসীমার মধ্যে ওই ধর্মীয় নবজাগৃতির বেগ অনেকখানি পরিমাণে ফুরিয়ে এসেছিল। আঠারো শতকে যে বাংলা কাব্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে তাতে কিন্তু বৈষ্ণব প্রভাবের শ্রেষ্ঠ সুফলের আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই, তার বদলে কবিগান, হাফ-আখড়াই, তরজা, পাঁচালী, রামায়ণ গান, কথকতা, যাত্রা ইত্যাদি বিধিমতে আসর জাঁকিয়ে বসেছে। তর্জা, পাঁচালী ও কবিওয়ালাদের গীতে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদের অসদ্ভাব নেই কিন্তু পদগুলিতে বৈষ্ণব-মহাজনদের রচিত পদাবলীর কাব্যের সৌন্দর্য ও কাব্যিক মাধুর্য নেই, আছে তদানীন্তন কালের রুচিবিকারের ছাপ।

আঠারো শতকের কাব্য ও গীত রচয়িতাদের মধ্যে যথার্থ শক্তির লক্ষণাক্রান্ত দুইজন মাত্র কবির দেখা পাই—ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ। কিন্তু এই দুজনাই স্বতন্ত্র ধারার কবি, পূর্বের কাব্য ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত নন। এঁদের মধ্যে আবার ভারতচন্দ্র একেবারেই ভিন্ন কোটির কবি—পূর্বসূরী ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরামের উত্তরসাধক। মুকুন্দরাম বাংলা কাব্যে বাস্তবতার প্রবর্তক। ভারতচন্দ্র পরিচ্ছন্ন ছন্দ আঙ্গিক শব্দশৈলীর নিপুণ রূপকার কবি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল বাংলা কাব্যে প্রথম সত্যিকারের গার্হস্থ্যসুরের অবতারণা করে, পক্ষান্তরে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল বাংলা কাব্যের দীর্ঘকালপুষ্ট গীতিকবিতার লালিত্য মাধুর্য আর কাল্পনিকতার ঐশ্বর্যের বিরোধিতা করে সজ্ঞানতঃ ফর্মের ঔজ্জ্বল্যের উপর মনোযোগ স্থাপন করে। ভারতচন্দ্র রূপসচেতন কবি কিন্তু ওই রূপ 'প্যাশন'-এর রূপ নয়, কাব্যের গঠনসৌন্দর্যের রূপ। এমন ছন্দ, মিল ও

শব্দের শিল্প- কুশল কবি গোটা মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে আর দ্বিতীয় আবির্ভূত হননি। ভারতচন্দ্রের দৃষ্টি গীতিকবিদের মত অন্তর্নিবেশী নয়, বহির্মুখ। বহির্মুখীনতা ক্লাসিসিজমের একটা প্রধান লক্ষণ। রোমান্টিক ধারার কবিরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক অন্তর্লীনতার চর্চাতেই সমধিক স্ফূর্তি অনুভব করে থাকেন।

আধুনিক বাংলা কাব্যের সূত্রপাতে যে তুজন কবিকে আমরা পাচ্ছি তাঁরা পরিষ্কার বহির্মুখ ধারার কবি। একজন ঈশ্বর গুপ্ত, অন্যজন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। গীতলতার প্রভাব তাঁদের উপর বড় একটা দেখা যায় না। তাঁদের দৃষ্টি ইহমুখী, সংসারসচেতন, দেশপ্রেমী। দেশপ্রেমের আবেগ বাংলা কাব্যে সম্পূর্ণ নতুন একটা সুর। এই তুজনার ভিতর ঈশ্বর গুপ্ত কম বেশী পরিমাণে দেশীয় ধারারক্ষী কবি, তবে রঙ্গলালের উপর ইংরেজী সাহিত্যের দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রভাব পড়েছিল। বলতে গেলে তাঁর পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্য ইংরেজী ন্যারেটিভ ভার্সের আদর্শে রচিত, তবে তার মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি বাংলা আখ্যায়িকা কাব্যের আদর্শ থাকাটাও অসম্ভব নয়। আখ্যায়িকা কাব্যের প্রকৃতিটাই এমন যে তাতে গীতিকবিতাসুলভ কল্পনাসমৃদ্ধি তথা ভাবমাধুর্যের অনুক্রমণ ঘটাবার সম্ভাবনা অল্প, পদ্যগন্ধিতাই এই কাব্যের মূলকথা। পদ্যগন্ধী যে রচনা তার ভিতর খাঁটি কবিতার আমেজ না থাকতে পারে কিন্তু এই ত্রুটির উপরে তার জিত এখানে যে, তাতে মোটামুটিভাবে যুক্তির ক্রম অনুসৃত হয়, ভাষার গঠনে শৃঙ্খলা, পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতার আদর্শ মান্য করা হয়। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব উনিশ শতকের আর যে কতিপয় বাঙালী কবি সবিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করে গেছেন, একমাত্র বিহারীলাল চক্রবর্তী ও তাঁর ভাবশিষ্য রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে আর সকলেই মূলতঃ আখ্যায়িকা কাব্যের কবি এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টি কম-বেশী বহির্মুখ —মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীন সেন। এমনকি কবি দ্বিজেন্দ্রলালকেও ঝোঁকের তারতম্য অনুযায়ী কোথাও প্রকট কোথাও মৃত্যু বহির্মুখী

দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন কবিরূপে আখ্যাত করা যেতে পারে। কবিতার অনুষঙ্গে যুক্তিবাদ কথাটা অবশ্য ভাল শোনায় না কিন্তু যুক্তিবাদ না বলে তাকে যদি বহিঃসচেতন দৃষ্টি বলা যায় তাহলে বোধহয় শব্দান্তর ব্যবহার করেও একই অর্থ প্রকাশ করা হয়। কবিতারও লজিক আছে। কবিতার ফর্মের নিপুণ বিন্যাস এই লজিকের একেবারে গোড়ার কথা।

গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে এলে দেখতে পাই, উনিশ শতকের প্রথম যুগের গদ্যলেখকদের রচনায় যুক্তিচর্চার লক্ষণীয় প্রাধান্য। রাজা রামমোহন রায়, রামরাম বসু, মৃতুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর মিশনের কেরী, মার্শমান, ওয়ার্ড, ম্যাক প্রমুখ লেখকবৃন্দ, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রথম যুগের গদ্য রচয়িতাদের ভাবাভঙ্গী সুস্পষ্ট ভাবেই যুক্তির ধাঁচায় রচিত—বাদবিবাদবিতর্কমূলক। তাঁদের রচনা সন্দর্ভ-ঘেঁষা। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী-কালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় সন্দর্ভের (ডিসারটেশন, ট্র্যাক্ট, ডিসকোর্স) প্রভৃতি অক্ষুণ্ণ রেখে তার উপর আরোপ করলেন ব্যক্তিভেদে কম বা বেশী পরিমাণে চারু বা কান্তি ও লাবণ্য। এঁদের ভিতর দেবেন্দ্রনাথ আর ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষা মূলতঃ কান্তিপ্রধান; অক্ষয়কুমার ও ভূদেবের ভাষা মূলতঃ যুক্তিপ্রধান। অক্ষয়কুমার ও ভূদেব বাংলা সাহিত্যে র‍্যাশানাল প্রোজের সার্থকতম কারুকৃৎ। অক্ষয়কুমারের চারুপাঠ, ঋজুপাঠ, পদার্থবিদ্যা, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (দুই খণ্ড) কিংবা আচার্য ভূদেবের পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষা যাঁরাই সমনোযোগে অনুধাবন করেছেন তাঁরাই জানেন যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক পর্বের এই দুই অগ্রগণ্য গদ্যলেখকের গদ্যশিল্পের গোটা ইমারতটাই যুক্তির বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে আছে। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ছাড়া গদ্যভাষার এমন যুক্তিপূর্ণ বাঁধুনি আর কারও লেখায় পরে দেখা যায়নি।

ইংরেজী ভাবধারার সূত্রে উনিশ শতকে বাংলায় যে নবজাগরণের

সূত্রপাত হয়েছিল তার একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তা মধ্যযুগীয় তিমিরাচ্ছন্নতা (অবস্‌কিউর্যান্টিজম) ও ধর্মীয় অতিপ্রাকৃতবাদের অবসান ঘটিয়ে তার জায়গায় যুক্তিমূলক চিন্তাভ্যাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়, ভূদেব ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ধারার মধ্যে এই চেষ্টার সচেতন অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে শেষোক্ত তিনজনের গদ্যপ্রবন্ধের ভাষা যুক্তির ভিত্তির উপর সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত। এ কথা অবশ্য সত্য যে, ভূদেব সামাজিক বিশ্বাসে অন্যদের তুলনায় রক্ষণশীল ছিলেন, সনাতন আচার-প্রথামান্যকারী নিষ্ঠাবান হিন্দুর তিনি একজন আদর্শ দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাঁর এই রক্ষণশীলতা তাঁর বিশ্বাসেই সীমাবদ্ধ ছিল, গদ্যভাষার চর্চায় তিনি নতুন যুগের র‍্যাশানাল সংস্কারকে পুরোপুরিরূপে আবাহন করেছিলেন। অক্ষয়কুমার ছিলেন চিন্তায় র‍্যাডিক্যাল—সাহিত্যক্ষেত্রে ডিরোজীয়দের সাক্ষাৎ উত্তর-শিষ্য। "প্রার্থনার ফল শূন্য" এই সিদ্ধান্তের প্রতিপাদনে তিনি যে বিখ্যাত ন্যায়-শৃঙ্খল (সিলোজিজম) প্রয়োগ করেছিলেন তা তার্কিক ইকোয়েশনের ক্ষেত্রে অদ্যাবধি একটা ক্লাসিক দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই অক্ষয়কুমারই বেদের অপৌরুষেয়তার তত্ত্ব খণ্ডন করে দেবেন্দ্রনাথকে স্বমতে আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, 'ঈশ্বর আছেন কি নেই' এই বিতর্কের প্রতিষ্ঠায় আত্মীয়সভায় হাত তুলে ভোট দেওয়ার রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। অক্ষয়কুমারের যুক্তিনিষ্ঠা এতই নিভাঁজ আর অকপট ছিল যে, তিনি কোন যুক্তিতেই গঙ্গানদীকে অন্যান্য নদী অপেক্ষা পবিত্রতর জ্ঞান করতে প্রস্তুত ছিলেন না—চূড়ামণি যোগ কি এই জাতীয় অন্য কোন স্নান যোগে সকলে গঙ্গা অভিমুখী চললে তিনি তার বিপরীত মুখে চলতেন। এই বিপ্লবী চিন্তানায়কের সত্যসন্ধিৎসা ও যুক্তিনিষ্ঠার যথাযথ মূল্যায়ন আজও হয়েছে বলে মনে হয় না। এক্ষেত্রে সম্যক্ পরিমাপন হলে দেখা যেত আজও অক্ষয়কুমারের মাথা অনেকের মাথা ছাড়িয়ে আছে।

অক্ষয়কুমারের পরেও যুক্তিপ্রধান গদ্যলেখকদের সারিবদ্ধ মিছিল চোখে পড়ে। প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রাজা রাজেন্দ্রলাল

মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, শিবনাথ শাস্ত্রী, বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকার লেখকবৃন্দ (যথা, রমেশচন্দ্র দত্ত, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, লালমোহন বিদ্যানিধি, রামদাস সেন প্রমুখ), কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বিদ্যাসাগর, পূর্ণচন্দ্র বসু, গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য, বীরেশ্বর পাঁড়ে, বিপিনচন্দ্র পাল, বিবেকানন্দ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি। নামপঞ্জীর ভিতর স্বভাবতঃই সবচেয়ে উজ্জ্বল নাম বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিম সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সবিস্তার আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

বঙ্কিম-সাহিত্যের দুটি ভাগ : তিনি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের মেজাজের সঙ্গে তাঁর প্রবন্ধের মেজাজের পার্থক্য আছে। উপন্যাসে তিনি সৌন্দর্যপ্রাণতায় ভরপুর, প্রবন্ধে মনস্বিতায় প্রখর। মনস্বিতা আবার দাঁড়িয়ে আছে যুক্তির দণ্ডের উপর ভর দিয়ে। বঙ্কিম যখন প্রবন্ধ লেখেন তখন সৌন্দর্যের জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে যুক্তির জগতে প্রবেশ করেন। ভাষার অলংকরণ অপেক্ষা ভাষার সাদামাঠা বিবৃতি, মণ্ডনকলা অপেক্ষা সহজতার রীতি তাঁকে তখন সমধিক চালিত করে। পাশ্চাত্য র‍্যাশানালিস্ট লেখকদের প্রভাবে তাঁর লেখনী কর্ষিত, এই র‍্যাশানালিজমের আদর্শ তিনি গ্রহণ করেছেন মিল বেন বেন্থাম প্রমুখ উপযোগবাদীদের, কোঁৎ প্রমুখ প্রত্যক্ষবাদীদের, বেকন, হবস লক হিউম প্রমুখ যুক্তিবাদীদের এবং নিউটন, লাইবনীৎস প্রমুখ গাণিতিক বিজ্ঞানীদের রচনাবলীর দৃষ্টান্ত থেকে। মিল আর কোঁৎ-এর প্রভাবই তাঁর উপর সবচেয়ে বেশী। লক আর হিউমের প্রভাবও কম নয়। এই সমস্ত বিভিন্ন ঘরানার ও দৃষ্টি-কোণের যুক্তিবাদী দার্শনিকদের রচনার সম্মিলিত প্রভাব বঙ্কিমের চিন্তার গড়নকে যুক্তির অমোচনীয় ছাঁচে এমনভাবে ঢালাই করেছিল যে. তিনি যখনই তাঁর প্রবন্ধে কোন বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে গেছেন তা অবলীলাক্রমে যুক্তির সরণী অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছে—এর জন্য

তাঁকে কোনপ্রকার আয়াস প্রয়াস করতে হয়নি। যুক্তিচর্চা বঙ্কিমের লেখনীতে একটা নিতান্ত অভ্যাসমসৃণ ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

সমালোচকদের কারও কারও মত, বঙ্কিম দেশীয় সূত্র থেকেও তাঁর যুক্তির অভ্যাসকে পুষ্ট করে তুলেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁরা নব্যন্যায়ীদের প্রভাবের উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিতরূপে কিছু বলতে অক্ষম। তবে এটা ঠিক যে, পাশ্চাত্য যুক্তিবাদীদের কাছে তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য র‍্যাশানালিটির সাক্ষাৎ মানস-সন্তান।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই দুর্মর যুক্তিনিষ্ঠার এক প্রধান প্রমাণ এই যে, তিনি তাঁর সাহিত্যের পরিকল্পনা থেকে ভক্তিভাবালুতাকে নির্বাসন দিতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর অনুশীলনতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র পুস্তকদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ চরিত্ররূপে চিত্রিত করেছেন সত্য কিন্তু সে শ্রীকৃষ্ণ পুরাণকথিত ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ নয়, গীতার শ্রীকৃষ্ণ, যিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুনকে জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়ের উপদেশ দিয়েছিলেন। এ কৃষ্ণ ব্রজবিহারী গোপীমনোমোহন বংশীধারী কৃষ্ণ নয়, নিষ্কাম ধর্মের প্রচারক কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্য শঙ্খ ফুৎকারী কৃষ্ণ। নবজাগ্রত ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে এই কৃষ্ণকে তিনি আদর্শ কৃষ্ণরূপে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন কিন্তু বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এ কৃষ্ণ মনে ধরেনি, তাঁরা বৃন্দাবনের রাধিকারমণ কেলিকুতূহলী কৃষ্ণকেই তাঁদের প্রাণের সমস্ত অনুরাগ সমর্পণ করে বুদ্ধি ও যুক্তিবাদকে নিরুৎসাহ করেছিলেন। এ যুক্তিবাদের পরাজয় তাতে আর সন্দেহ কী। আর পরাজয়ই যদি না হবে তো পরবর্তীকালের বাঙালীর এ হতদশা কেন। আবেগগদগদ ধূলিধূসরিত ভাবসমাধিপ্রাপ্ত ভক্তিভাবালুতা একদিকে, অন্যদিকে তাবিচ-কবচ-মাদুলি-শান্তিস্বস্ত্যয়ন-তুকতাকে দেশ ছেয়ে যাবে কেন। মঠ-মিশন-আশ্রম-আখড়া ইত্যাদির এত আধিক্য ঘটবে কেন।

মাইকেল মধুসূদন আখ্যায়িকা কাব্যের কবি তবে তাঁর কবিতায় দার্ঢ্য আর বীর্যবত্তার সংস্কারের সঙ্গে গীতিকবিতার কারুণ্য আর আর্তি

যুক্ত হয়ে এক অদ্ভুত মিশ্র রসের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর কাব্যের ওজঃগুণ ও সমুদ্রকল্লোলবৎ ধ্বনিগর্জন বাংলা কাব্যে সম্পূর্ণ এক নূতন সংযোজন, সমালোচক নলিনীকান্ত গুপ্ত এটিকে একদিকে সংস্কৃত কাব্যাদর্শ অন্যদিকে কেলটিক (celtic) গুণের বিপরীতে দুইয়ের মধ্যস্থিত রোমক কাব্যাদর্শরূপে বর্ণনা করেছেন। রোমক কাব্যবন্ধ-সুলভ এই 'অ্যাটিক কোয়ালিটি' বাংলা কবিতায় সম্পূর্ণ নতুন এক আয়তন, যাকে রবীন্দ্রনাথ সহ অনেকেই গোড়ার দিকে প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারেন নি। বালকবয়সী রবীন্দ্রনাথের মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা পরিণতবয়সী রবীন্দ্রনাথ অবশ্য প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন কিন্তু যতই প্রত্যাহার করুন প্রথম বয়সের সমালোচনার মধ্যেই রবীন্দ্ররুচির আসল আদলের পরিচয় পাওয়া যায়। বিহারীলালের ভাবশিষ্য বালক রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ ভিন্ন অন্য ভূমিকা প্রত্যাশিত ছিল না।

মধুসূদনের কাব্যের ওজঃগুণ শুধু যে সর্বপ্রকার নমনীয়তা আর অতিকোমলতার প্রতিষেধক তাই নয়, তার ভিতর বহির্মুখী বস্তুনিষ্ঠ মননের সংস্কারটিও অনুস্যূত হয়ে আছে। বৈষ্ণব কাব্যের কান্তকোমল পদাবলীতে বড় বেশী মাধুর্য লালিত্য আব পেলবতা। কোমল কাব্য একটা জাতকে রসস্নিগ্ধ করে রাখলেও সঙ্গে সঙ্গে তাকে অল্পবিস্তর নির্বীর্য করে রাখারও মন্ত্রণা দেয়। মধুসূদন তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধ্বনিগাম্ভীর্যের দ্বারা ওই নির্বীর্যতাকেই প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন। তিনি এই ক্ষেত্রে তাঁর দুইজন শক্তিশালী উত্তরাধিকারীও রেখে গিয়েছেন—হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। যদিও তাঁদের মধুসূদনের প্রতিভা ছিল না।

কিন্তু মধুসূদনের এই ধারা বাংলা কাব্যে পরবর্তীকালে রক্ষিত হয়নি। বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের কাব্যকল্পনার স্রোতমুখে উদ্ধারিত গীতলতার উদ্দাম প্রবাহ বাংলা কবিতার আর সব সংস্কার ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী কবি-ব্যক্তিত্ব যে-সর্বপ্লাবী ব্যক্তিসাক্ষিক গীতোচ্ছ্বাসের জন্ম দিয়েছে তা কাব্যের সমস্ত ক্ষেত্র অধিকার করে নিয়েছে, কবিদের পক্ষে অন্য কোন ধরনের পরীক্ষা-

নিরীক্ষার আর বিশেষ কোন ফাঁক রাখেনি। কথা ও কাহিনীর রচনাগুলির পর রবীন্দ্রনাথের কাহিনী-কবিতার স্রোত ক্ষীণ ধারায় বহমান। বিদায় অভিশাপ, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ, গান্ধারীর আবেদন, চিত্রাঙ্গদা জাতীয় কয়েকটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘবিস্তারী রচনা বাদ দিলে যথার্থ সংজ্ঞার্থে আখ্যায়িকা-কাব্যের উদাহরণ সমগ্র রবীন্দ্র কাব্য-সাহিত্যে দুর্লভ। খণ্ড-কবিতার উপর কবিদের মনোযোগ এতটাই নিবদ্ধ যে, ধ্রুপদী ধারার কাব্য রচনার সংস্কারটাই মরে যেতে বসেছে। এই কালে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সজ্ঞানতঃ মধুসূদনের শব্দসংস্কার গ্রহণ করেছিলেন তবে এই মাইকেলী ধ্বনিগাম্ভীর্য ও শব্দৈশ্বর্যের প্রয়োগ তিনি গীতিকবিতাতেই সীমিত রেখেছিলেন, কাহিনী কবিতা কিংবা আখ্যায়িকা-কাব্যে সম্প্রসারিত করেননি।

গীতলতার উপর অত্যধিক ঝোঁক পড়ায় একালীন কবিদের অন্তর্নিবেশের অভ্যাস বেড়েছে, তাঁদের কবিতায় ব্যক্তিসাক্ষিক কল্পনা ও অনুভবের নতুন নতুন মাত্রা যোজিত হয়েছে কিন্তু বহির্মুখীনতার প্রবণতা সেই পরিমাণেই যেন সংকুচিত হয়ে গেছে। নতুন কালের কবিতা পরিবেশসচেতন আর সামাজিক প্রশ্ন সমস্যা সম্বন্ধে জাগ্রতচৈতন্য বলে শুনতে পাই কিন্তু মুষ্টিমেয় সংখ্যক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে আর সকলেই যেন আত্মলীনতার আবেশে নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের খোলের ভিতর গুটিয়ে আছেন। নার্সিসাসধর্মী আত্মরতিই যেন অধিকাংশ কবির মানসধর্ম। পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে এই অনীহা মোটেই সুস্থতার ইঙ্গিত করে না।

গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে এলে দেখতে পাই, একালের গদ্য রচনাও যেন কাব্যিকতার সংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন—অক্ষয় দত্ত কিংবা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গদ্যের আদর্শ বাংলা সাহিত্য-সংসার থেকে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে বলে সন্দেহ হয়। কাল্পনিকতার দীপ্তচ্ছটায় ভাস্বর, কখনও কখনও সরস কৌতুকে মধুর রবীন্দ্রনাথের উপমা-উৎপ্রেক্ষাবহুল গদ্য সৃষ্টি হিসাবে পরম আস্বাদ্য কিন্তু আদর্শ গদ্যের নমুনা হিসাবে গ্রহণীয়

কিনা বলা মুশকিল। বঙ্গভঙ্গের আগে ও পরে জাতীয়ভাবোদ্দীপক যে অজস্র প্রবন্ধ কবির লেখনী মুখে নির্গত হয়েছে তাদের বক্তব্যের ভিতর প্রাচীন ভারতের যশোকীর্তনের পশ্চাৎটান একটু বেশী মাত্রায় প্রশ্রয় পেলেও ওই গদ্যের চাল কিন্তু আশ্চর্য সহজ সাবলীল স্বচ্ছন্দ প্রবাহী, সাধু ভাষার আশ্রয়ী হয়েও মোটেই কৃত্রিম নয়। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর সবুজ পত্র-এর কথ্যরীতির আন্দোলনের প্রভাব বৃত্তের মধ্যে আসার পরে সে ভাষা কেমন যেন ভঙ্গীপ্রধান হয়ে উঠেছে। সে ভাষায় স্বাদুতা আছে প্রচুর কিন্তু কৃত্রিমতাও বড় কম নয়।

মনে হয় রামেন্দ্রসুন্দর একমাত্র বাংলা গদ্য লেখক যিনি তাঁর রচনায় অক্ষয়-ভূদেবের বৈজ্ঞানিক মেজাজ আর রবীন্দ্র-গদ্যের কান্তি ও লাবণ্যের সমন্বয় ঘটাতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি আজও একক দৃষ্টান্ত হয়েই আছেন, তার আর উত্তরসূরী সৃষ্টি হয়নি। যুক্তিবাদের প্রসারের পথে এই অভাব শুভ সূচনা করে না, বলাই বাহুল্য।

☐ রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা ☐

'আধুনিকতা'কে যদি একটা বিশেষ ধরনের মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ বলা যায় তাহলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও অন্যবিধ শিল্পসৃষ্টির মধ্যে তার কতদূর প্রতিফলন ঘটেছে এই রকমের একটা প্রশ্ন আজকাল সমালোচক মহলে খুবই আলোড়িত হতে দেখা যায়। প্রশ্নটি নিয়ে কিঞ্চিৎ নাড়াচাড়া করা যেতে পারে।

'আধুনিকতা' একটা বিশেষ ধরনের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী হলে কী তার লক্ষণ? এ ব্যাপারে মতভেদের সম্ভাবনা থাকলেও এগুলিকে বোধহয় আধুনিকতার 'সামান্য লক্ষণ' মনে করা যেতে পারে— যুক্তিবাদ, সংশয় প্রবণতা (সীনিসিজ্ম্), অজ্ঞেয়বাদ (অ্যাগনষ্টিসিজম্), নৈরাশ্য-পীড়া (পেসিমিজম), অশুভের চেতনা (সেন্স অব দি ইভিল), সংকটের চেতনা, সজ্ঞান মনের অন্তরালবর্তী নির্জ্ঞান কামনা-বাসনার প্রবলতার বোধ, ইত্যাদি। সেই সঙ্গে আরও কিছু লক্ষণ যোগ করা যায়, যথা, স্পর্ধা, ঔদ্ধত্য, শ্রদ্ধাহীনতা, দুঃসাহস, নাস্তিক্য প্রভৃতি। তবে এসব একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ের লক্ষণ বিধায় এগুলিকে সামান্য লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত না করাই বোধকরি শ্রেয়। সামান্য লক্ষণ অর্থাৎ সাধারণ লক্ষণ, অর্থাৎ যে সকল লক্ষণ এ প্রান্তে বা ও প্রান্তে বিরাজ করে না। সুতরাং প্রান্তীয় লক্ষণগুলিকে এই তালিকা থেকে বাদ দেওয়াই ভাল।

এখন, উল্লিখিত লক্ষণগুলির মানদণ্ডে যদি রবীন্দ্র-শিল্পসাহিত্যের বিচার করা যায় তাহলে সেই সাহিত্যে ও শিল্পে আধুনিকতার কী পরিমাণ ও কতদূর প্রভাব লক্ষণীয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, প্রথম বয়সের রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে পূর্বোক্ত বিশেষ চিহ্নমণ্ডিত আধুনিকতার তেমন প্রতিফলন না ঘটলেও মধ্য বয়স থেকেই দেখা যায় রবীন্দ্র-

চেতনায় সংশয়বাদ, নৈরাশ্য, অমঙ্গলের বোধ, সংকটের চেতনা প্রভৃতি লক্ষণ ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এবং যত তিনি বয়োবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়েছেন তত তাঁর ভিতর এই সব আধুনিক যুগোচিত লক্ষণাদি উত্তরোত্তর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

দৃষ্টান্ত সহযোগে যেমন এ কথা প্রমাণ করা যায় তেমনি আবার উত্তরকালীন রবীন্দ্ররচনার সাধারণ লক্ষণ দৃষ্টেও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে। মধ্য ও উত্তর পর্বের রবীন্দ্রসৃষ্টিরাজির গহনে প্রবেশ করলে এটাই উপলব্ধ হয় যে, রবীন্দ্রনাথ অতিশয় যুগসচেতন শিল্পী ছিলেন, যুগের ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁর শিল্প-মানসিকতারও যথেষ্ট পরিবর্তন ও বিবর্তন হয়েছিল তাঁর উত্তরকালীন পর্যায়ক্রমিক শিল্পসৃষ্টির ধারার ভিতর। আজকাল 'যুগযন্ত্রণা' কথাটার সবিশেষ প্রচলন দেখা যায়। এটাকে যদি এই কালের কবি-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের মানসিক ও আত্মিক কষ্টের সমষ্টিগত প্রকাশ বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলে সেই যুগযন্ত্রণার দ্বারা কবির চেতনা যথেষ্ট পরিমাণে অনুবিদ্ধ হয়েছিল এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের সাহিত্যসৃষ্টিতে অবলীলায়িত আনন্দবাদ, ঔদার্যবাদ ও শ্রেণীচেতনাবিহীন মানবতাবাদী মনোভঙ্গীরই প্রাধান্য। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের পঞ্জরে পঞ্জরে বিদ্যমান যে দুঃখবেদনার অনুভূতি, তার চেতনা তখন রবীন্দ্র-মানসিকতায় অনুপস্থিত। তিনি তখন নিসর্গপ্রেমে আত্মহারা, উপনিষদীয় ভগবদভাবনায় নিমজ্জিত, এবং জীবনের স্তরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাবিল আনন্দের তত্ত্বে বিশ্বাসী। অপরিমিত আশা ও বিশ্বাসে ভরপুর তাঁর এ সময়কার কাব্যের সুর। আধুনিকতার একটা অন্যতম লক্ষণ এই যে, অতিমাত্রিক আনন্দ-বিহ্বলতার অনুভবের মধ্যেও কোথায় যেন একটা সংশয়ের কাঁটা থেকে থেকে খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধে আনন্দের মধুরতাকে তরল করে দেয়, কখনও কখনও রীতিমত বিস্বাদ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক পর্বের সৃষ্টিরাজিতে এই সংশয়িত দ্বিধাদ্বন্দ্ব একপ্রকার নেই বললেই চলে।

'ছবি ও গান' কাব্যের 'রাহুর প্রেম' জাতীয় দু-একটি কবিতায় এই সংশয়বাদের খানিকটা আভাস দেখা যায় ঠিক কিন্তু সন্দেহের কণ্টক-শূন্য দুঃখের স্পর্শলেশহীন আনন্দের নির্বাধ স্রোতে ভাসমান ওই পর্বের রবীন্দ্র-কাব্যতরণীতে ওইটুকু সংশয়ের দোলা কতটুকু আর আলোড়ন জাগাতে পারে? কাজেই নৌকার গতিবেগে এক-চিলতে আবর্তের বাধা দেখা দিতে না দিতেই আবার নৌকা তরতর গতিতে বয়ে চলে—স্রোতের মসৃণ ধারায় সামান্যতম বুদবুদ ওঠারও আর অবসর মেলে না। দারিদ্র্যদুঃখের চেতনা রবীন্দ্রসৃষ্টিতে প্রথম স্পর্শগ্রাহ্যভাবে পাওয়া যায় 'ছিন্নপত্রাবলী'র চিঠিগুলির মধ্যে আর গল্পগুচ্ছের গল্পসমূহের ভিতর। কালের হিসাবে এটি হলো বিগত শতকের নব্বুইয়ের দশকের কাল। এই কালে এসেই প্রথম আমরা অনুভব করি রবীন্দ্রভাবমানস আর পূর্বের মত বিশুদ্ধ ও অনাবিল আনন্দবাদে আত্মমগ্ন হয়ে নেই, তার ভাবপরিমণ্ডলের ভিতর লক্ষণীয়ভাবে দুঃখের ছিটে লেগেছে। আধুনিক যুগোচিত দুঃখ—সমাজের রোগ-শোক অভাব-অনটন শোষণ ও বঞ্চনার বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার দুঃখ। এই চেতনার সবচেয়ে সার্থক অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি 'চিত্রা' কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' নামক প্রসিদ্ধ কবিতাটির (১৩০০) মধ্যে। এই কবিতার সুর রবীন্দ্রকাব্যে একেবারেই অভিনব, কবিতায় অন্ততঃ এর কোন পূর্ব-নজীর নেই। আধুনিক কালোচিত দুঃখবাদের এমন সুন্দর শৈল্পিক নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের গোটা কাব্যসৃষ্টির মধ্যেও আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু আক্ষেপ এই যে, এই চমৎকার ভাবটি রবীন্দ্রকাব্যে তখনও পর্যন্ত একটি স্থায়ী ভাব হয়ে ফুটে উঠতে পারেনি, কল্পনার ক্ষণিক পার্শ্ব-পরিবর্তনের মায়া জাগিয়ে পরক্ষণেই আবার মিলিয়ে গিয়েছিল। বাস্তব-চেতনার রূঢ় রুক্ষ কঠিন আঘাতের এক ঝটকায় কবি সংসারের তীরে তাঁর কাব্যতরীকে এনে ভেড়ালেন কিন্তু সে কয়েক লহমার জন্য মাত্র। তার পরেই আবার যে-কে-সেই, তাঁর তরীর মুখ পূর্ববৎ নিরুদ্দেশের অভিমুখে ঘুরে গেল। আগের মত তেমনি তাঁর সাধের সোনার তরণী, প্রকৃতি-

বন্দনা আর ঐশী আরাধনার স্রোত কেটে বয়ে যেতে লাগলো। সাধারণ মানুষের সংসার ও সমাজের শতবিধ দুঃখব্যথা ওই অবারিত মসৃণ গতি-তরঙ্গের প্রবহমানতাকে ব্যাহত করে উপল আঘাতে সামান্যই আবর্ত-সঙ্কুলতার সৃষ্টি করতে পারলো। ঘুমের আবেশের মধ্যে তন্দ্রা-জাগরণের ঝোঁক এলে হঠাৎ মানুষ পাশ ফিরে শোয়, তার পরই আবার আর এক দমকে ওপাশে কাৎ হয়ে ঘুমায়। এও অনেকটা সেই রকমের ব্যাপার। রবীন্দ্র-কাব্যে এবার ফিরাও মোরে-র চেতনার জাগরণ একটা সাময়িক পার্শ্ব-পরিবর্তন মাত্র ছিল, তাতে তখনও স্থায়িত্বের লক্ষণ দেখা দেয়নি।

এর পরে আরও প্রায় দুই দশক কাল রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে নিসর্গ, ঈশ্বর আর শ্রেণী-নির্বিশেষ মানবতার একটানা জয়-বন্দনার কাল। আধুনিক যুগোচিত সন্দেহ-সংশয় হতাশা দুঃখবোধ নিরানন্দেয় চেতনা ওই বিশুদ্ধ আনন্দের সম্মোহনের ভিতর খুব সামান্যই দাগ ধরাতে পেরেছিল। কেবল দেখা যায় নৈবেদ্যের কিছু কবিতায় এবং গীতাঞ্জলির কিছু গান ও কবিতায় (যথা, ভজন পূজন সাধন আরাধনা / সমস্ত থাক্ পড়ে, অথবা হে মোর দুর্ভাগা দেশ, ইত্যাদি) বর্তমান কালের রাষ্ট্রিক মদমত্ততা তথা সংকীর্ণ জাতীয়তার উদ্ধত আস্ফালনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ অথবা আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের অসারতা সম্পর্কে প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠের ঘোষণা কিংবা অপমানিত-বঞ্চিত-ভাগ্যহত সম্প্রদায়ের মানুষের দুঃখ-দৈন্যের প্রতি অপরিমেয় সহানুভূতির প্রকাশ কবিকে স্পষ্টতই আধুনিক জগতের ধ্যান-ধারণার অনেক কাছাকাছি এনে স্থাপন করেছে। কবিকে যেন আমরা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী নিকটের মানুষ বলে ভাবতে শিখতে পারছি। তিনি আর আমাদের ভাবের আকাশে সুদূরের চাঁদ হয়ে নেই, অনেক কাছের ধনে রূপান্তরিত হয়েছেন।

কিন্তু তখনও বোধহয় রূপান্তরের পর্ব পূর্ণ হওয়ার কিছু বাকি ছিল। বাকি কাজটুকু সম্পন্ন করে দিল প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের উত্তাল আলোড়ন-বিলোড়নকারী প্রচণ্ড আঘাত-সংঘাতের সম্বিৎ-জাগানিয়া প্রক্রিয়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের ও পরের রবীন্দ্রনাথে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। বলা

যেতে পারে যুদ্ধের আঘাত-সংঘাতের ভিত কাঁপানো পরিবর্তনের ফলে পুরাতন পৃথিবীর ভাব-জগতের গর্ভ থেকে সম্পূর্ণ নূতন রবীন্দ্রনাথের জন্ম হলো। আধুনিক পৃথিবীর অনেক কাছাকাছি স্তরের ধ্যান-ধারণার জগতে তিনি জেগে উঠলেন। যে-অমিত আশাবাদ আর উপনিষদীয় ব্রহ্মবাদের ধ্রুব প্রত্যয়ে এতকাল তিনি লালিত-বর্ধিত হয়ে এসেছেন তার নিশ্ছিদ্র অবয়বে সন্দেহ-অবিশ্বাস দ্বিধা-দোদুল্যমানতার ফাটল ধরলো। বিশ্বাসের যে-ভূমি এতকাল তিনি সজোরে আঁকড়ে ধরে ছিলেন এবং সহস্র ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও যা তাঁকে মূল থেকে উৎপাটিত হতে দেয়নি, আজ দেখা গেল পায়ের তলা থেকে সেই নিশ্চিত আশ্রয়ের মৃত্তিকা যেন সরে যেতে বসেছে ; পুরাতন আশাবাদ আর আনন্দবাদের মধ্যে তিনি আর পূর্ববৎ সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছেন না। ব্রহ্মবাদের ভিতর এতকাল যে ধরনের অস্তিত্বের সার্থকতার চূড়ান্ত প্রমাণ পেয়ে এসেছেন তা তিরোহিত হতে বসেছে। অর্থাৎ রবীন্দ্র-মানসিকতায় দেখা দিয়েছে সন্দেহ-দ্বিধাদ্বন্দ্ব, আপেক্ষিক বিশ্বাসহীনতা, কিছু পরিমাণ অজ্ঞেয়বাদ, নৈরাশ্যচেতনা, সংকট দ্বারা কবলিত হওয়ার চেতনা (যাকে কবি-সমালোচক বিষ্ণু দে বলেছেন 'ক্রাইসিস্‌বোধ'), ইত্যাদি। সজ্ঞান আশা-আকাঙ্ক্ষার আস্তরণের তলায় যে একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী নির্জ্ঞান কামনা-বাসনার জগৎ মনের অন্ধকার-কোণে লুকিয়ে আছে তার বোধও এই সময় থেকে কবি-মানসিকতায় উত্তরোত্তর প্রভাব বিস্তার করে চলতে লাগলো। অর্থাৎ এক কথায় প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের বিপর্যয়কর অভিজ্ঞতা ও তৎ-পরবর্তী বৎসরগুলির প্রভাব যাকে ইংরেজীতে বলে **catalytic agent** তেমন কার্যকারকের ভূমিকা গ্রহণ করলো।

'বলাকা'র কাল থেকেই প্রকৃতপক্ষে গোত্রান্তরণের শুরু। বলাকার একাধিক কবিতায়, বিশেষ করে 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটির মধ্যে কবির এই আধুনিক-যুগোচিত যন্ত্রণাদিগ্ধতার পরিচয় নিঃসন্দিগ্ধরূপে পাওয়া গেল। প্রবন্ধে 'সবুজপত্র'-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকে লেখা 'বাতায়নিকের পত্র' এবং তাঁরই রচিত 'রায়তের কথা' বইয়ের ভূমিকায় কবির লেখনীতে

নূতনকালোচিত যুক্তিবাদ, সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি অনুরাগ, অন্যায়-অসহিষ্ণুতা, সাম্যাদর্শের প্রতি প্রীতি প্রভৃতি যুগধর্মসম্মত সুন্দর লক্ষণগুলি ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠলো। আরও বেশ কিছুকাল পরে 'রাশিয়ার চিঠি' বইয়ের ঐতিহাসিক পত্রগুচ্ছে এবং 'কালান্তর'-এর রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রবন্ধাবলীতে নিপীড়িত-শোষিত শ্রেণীর মানুষের প্রতি দরদ, নিরক্ষরদের শিক্ষাহীনতার জন্য বেদনা, ধনী-নির্ধনের দুস্তর পার্থক্যে উষ্মা, সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, সমাজ-প্রচলিত একাধিক ধর্মীয় ও অন্যান্য কুসংস্কারের প্রতি তীব্র রোষ, অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মাচরণের শূন্যগর্ভতার দিকে অঙ্গুলিক্ষেপ, জাতিতে জাতিতে 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাবের নিন্দা, আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র ও বন্ধুতার আদর্শের প্রতি অস্খলিত আস্থার ঘোষণা, প্রভৃতি কবিচিন্তার কতকগুলি প্রধান উপজীব্য বিষয়ে পরিণত হলো। এ সমস্তই আধুনিক কালের প্রত্যয় আর এই প্রত্যয়গুলি নূতন রবীন্দ্রনাথের ভাব-জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে সংলগ্ন হয়ে গেল।

উপন্যাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এলে দেখতে পাই, যাকে আধুনিক পরিভাষায় ইংরেজিতে sense of the evil (অশুভের চেতনা) বলা হয় তারও পরিপ্রকাশ ঘটলো কবির যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর পর্বের গল্পোপন্যাসগুলির ভিতর। 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে', 'যোগাযোগ', 'দুই বোন', 'মালঞ্চ', 'চার অধ্যায়', প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'স্ত্রীর পত্র', 'ল্যাবরেটরী', 'রবিবার', 'বদনাম', প্রভৃতি গল্পের একাধিক চিত্র ও চরিত্র একথারই প্রমাণ দিল যে, সমাজে-সংসারে নিরবচ্ছিন্ন ভাল বলে কিছু নেই, ভালর সঙ্গে মন্দের খাদ মিশে থাকে, কখনও কখনও একই ব্যক্তিতে ভাল-মন্দের জড়াজড়ি, মেশামেশি। রবীন্দ্র উপন্যাসে সত্যিকারের 'ভিলেন' বা খল-নায়ক চরিত্র দেখা যায় না, এরকমের একটা অভিযোগ এতকাল সমালোচক মহলে মুখে-মুখে ফিরতো। কিন্তু ঘরে-বাইরে উপন্যাসের সন্দীপ চরিত্রসৃষ্টির পর সে অভিযোগের আর কোন সারবত্তা রইলো না। এক হিসাবে যোগাযোগের মধুসূদন চরিত্রকেও খল-নায়ক

বলা যায়। তার রুচির স্থূলতা, ক্রূরতা, উৎকট প্রভুত্বপ্রিয়তা, কামনা-বাসনার অলজ্জতা একটি ব্যক্তির আধারে পাপবোধেরই শারীর প্রকাশ-মাত্র। নারীর জৈব ক্ষুধার সূক্ষ্ম শৈল্পিক প্রকাশ চতুরঙ্গ উপন্যাসের দামিনী চরিত্রের মধ্যে, যে চরিত্রটিকে আগেকার পর্বের লেখা 'চোখের বালি' উপন্যাসের বিনোদিনী চরিত্রের উত্তর সংস্করণ মনে করতে পারা যায়। বিনোদিনীরই মত দামিনী খানিকটা ছিটগ্রস্তা, প্রেম-পাগলিনী। অন্যদিকে ল্যাবরেটরী গল্পের নায়িকা সোহিনীর অলজ্জ দেহ বাসনাকে লুকোবার মত শিল্পের শুষ্ক আবরণটিও তার কামনার গায়ে জড়ানো নেই, গল্পকার এখানে এমনই নিরঙ্কুশ হয়ে উঠেছেন তাঁর লেখনীতে। জৈব বা দেহজ ক্ষুধা সমাজ-অনুমোদিত প্রকাশ্য পথে পরিতৃপ্তির উপায় খুঁজে না পেয়ে নির্জ্ঞান মনের রাজ্যে সেঁধিয়ে গেলে নরনারীর জীবনে কী সাংঘাতিক দৌরাত্ম্যের সৃষ্টি করতে পারে—আধুনিক মনোবিকলনের এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে সার্থক শিল্পরূপে প্রকাশ করেছেন তাঁর গল্পোপন্যাসের কয়েকটি চরিত্র-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

তবু বুঝি লেখায় এই ভাবটিকে পুরাপুরি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, তাই কবিকে রেখার শরণ নিতে হলো। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি সে তো ছবি নয়, সে যেন মানুষের অন্তরের গহনে গুহায়িত সুপ্ত কামনা-বাসনার উদ্ভট রূপবৈচিত্র্যের এক সারিবদ্ধ মিছিল। সভ্যতার আদিম স্তরে মানুষের অলজ্জ দেহক্ষুধা কিংবা আহার ক্ষুধার উপর যেমন কোন ভ্রূকুটি-কুটিল সমাজ-শাসনের আব্রু ছিল না, তেমনি রবীন্দ্র-চিত্রকলার এই জগতে যেন দেখতে পাই তারই ধারা বেয়ে মানুষের কামনা-বাসনা এখানে কখনও উৎকট কখনও কিম্ভূত আকারে নির্জ্ঞান মনেরই বন্ধন ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। একাধিক ছবিতে মানুষের স্বাভাবিক রূপের বিকার ঘটিয়ে যে-জান্তব রূপের প্রকাশ লক্ষ্য করি, কখনও কোন প্রাগৈতিহাসিক পশুর রূপ কখনও আর কোন অদেখা জীবের রূপ—সে আর কিছু নয়, মানুষেরই অন্তরের অন্ধকার কোণা-খামচিতে ঘাপটি-মেরে থাকা বিকৃত ক্ষুধাগুলির ব্যঞ্জনাধর্মী ভয়াল-

ভীষণ চেহারা মাত্র। আর কোন প্রকরণের সাহায্যে যদি নাও হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রকলার দ্বারা অন্ততঃ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন যে, আধুনিকতার শিল্পে অথবা শিল্পে আধুনিকতায় তিনি কারও চাইতে কিছু কম যান না। আধুনিকদের অস্ত্রে আধুনিকদের ঘায়েল করবার কৌশল যে তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন আটষট্টি বছর বয়সে 'শেষের কবিতা' উপন্যাস লিখে একবার সে কথার প্রমাণ দিয়েছিলেন। আর একবার প্রমাণ রাখলেন সত্তরোর্ধ্বে বাণপ্রস্থের বয়সে বিচিত্র সব চিত্রাবলী এঁকে।

এ তো গেল নির্জ্ঞান মনের রূপায়ণের দিক। অন্যপক্ষে অজ্ঞেয়বাদ বা অ্যাগনষ্টিসিজমের শিল্পরূপের কথা যদি ওঠে, রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের একাধিক কবিতায় এই ভাবটি ফুটে উঠেছে দেখতে পাই। অজ্ঞেয়বাদ ঠিক নাস্তিকতা নয়, তবে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের মধ্যবর্তী এক মিশ্র ভাবাবস্থা (আমাদের কোন আধুনিক কবি একেই বলেছেন 'শুভ নাস্তিত্ব')—যার মধ্যে কিছু পরিমাণ সন্দেহ ও অবিশ্বাস স্বতই অনুবিদ্ধ হয়ে আছে। একেবারে পুরাপুরি অবিশ্বাস নয় আবার একেবারে অখণ্ড বিশ্বাসও নয় আলো-আঁধারিতে ঘেরা এই মিশ্র মনোভাবের লীলা শেষের যে-কটি কবিতায় প্রকাশমান তার মধ্যে পড়ে—রূপনারাণের কূলে, প্রথম দিনের সূর্য, দুঃখের আঁধার রত্রি, তোমার সৃষ্টির পথ, প্রভৃতি কবিতা। তবে একেবারে শেষ নামীয় কবিতাটিতে একটা ধ্রুব আস্তিক্যের সুরও বুঝি লক্ষ্য করা যায়। মৃত্যুর মাত্র আট দিন আগে এই কবিতাটি রচিত। সব সংশয়-সন্দেহ ছলাকলার উজান ঠেলে যে-মানুষ নিশ্চিত বিশ্বাসের তীরে নিয়ে বাঁধতে পেরেছে তার তরী, শেষ জিত তারই—এই ভাবের অনুরণনে কবিতাটির পরিসমাপ্তি। এটি হলো চিরন্তন রবীন্দ্রনাথের বাণী—নিছক আধুনিক রবীন্দ্রনাথের নয়।

☐ স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলা সাহিত্যের দান ☐

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পূর্ববর্তী কমবেশী দেড়শ' বছর কালমধ্যে বাংলা সাহিত্যের লেখকবৃন্দ কোন না কোন ভাবে জাতীয় মুক্তির আদর্শের সহায়তা করেছেন। কাব্য রচনার মাধ্যমেই হোক অথবা নাট্য রচনার মাধ্যমেই হোক কিংবা গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সংবাদপত্র সেবার মাধ্যমেই হোক বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকগণ জাতীয়তার ভাবধারার পরিপুষ্টিতে তাঁদের ভূমিকা যথাযথভাবেই পালন করে এসেছেন। একদিকে রাজনৈতিক নেতা ও দেশের অগণিত সংখ্যক স্বদেশ-প্রেমিক নরনারী জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে জোয়ারের বেগ সৃষ্টি করেছেন, অন্যদিকে বঙ্গবাণীর সেবকেরা তাঁদের নানামুখী প্রেরণাময় সৃষ্টির মাধ্যমে সেই জোয়ারের বেগকে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছেন। অবশ্য গোড়ায় গোড়ায় জাতীয় ভাবোদ্দীপক রচনার পরিমাণ খুব সামান্যই ছিল, সত্যি কথা বলতে, এই খাতে প্রারম্ভিক প্রয়াস খুব উল্লেখযোগ্য ছিল তা বলা চলে না ; কারণ তখনও জাতীয়তার ধারণা জনমনে বিশেষ দানা বেঁধে ওঠেনি কিংবা লেখকদের অনুপ্রাণিত করে তোলবার মতো গোপনীয় কোন রাজনৈতিক আন্দোলনেরও সৃষ্টি হয়নি। আমরা যে-সময়ের কথা বলছি সেটা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পর্ব—এই পর্বে জাতীয়তা বা ন্যাশানিলজম্ একটি সুগঠিত প্রত্যয়ের রূপ ধারণ করতে তখনও ইতিহাসের অন্যান্য সহায়ক শক্তির অপেক্ষায় ছিল।

বাংলায় জাতীয়তার ধারণা সৃষ্টির মূলে আছে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-বলীর প্রেরণা এবং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ দেশবরেণ্য নেতাদের উদ্দীপনাময় কর্ম কাণ্ড ও তেজোগর্ভ রচনা ও ভাষণাদির ভূমিকা। জাতীয়তাবাদ একটি বিদেশী

ধারণা, যা ইংরেজ শাসনের আরোপিত পরাধীনতার কারণে জনমনে ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং ওই পথে তাঁদের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করেছিল। ইংরেজরা এদেশে আসার আগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে ভাবগত ও সংস্কৃতিগত যোগ থাকলেও রাজনীতিগত বিশেষ যোগ ছিল না। বরং রাজনীতির মাপকাঠিতে বিচার করতে গেলে বলতে হয়, দেশের বিভিন্ন অংশগুলি ছিল পরস্পর-বিচ্ছিন্ন খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত। ইংরেজের শাসন এই পরস্পর-বিচ্ছিন্নতার অনৈক্যের মধ্যে এনে দেয় ঐক্য, সংহতির একটা চেতনা। এই চেতনাই পরে অনুকূল ক্ষেত্র পেয়ে ধীরে ধীরে আরও অনেক বেশী জোরদার হয়ে উঠতে থাকে।

কিন্তু প্রথম যুগের এই অস্ফুট জাতীয় চেতনার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলার তদানীন্তন কবি ও সাহিত্যিকগণ সহজাত দেশপ্রেমের আবেগে জন্মভূমির বন্দনা-গান করেছেন। কেউ কেউ রীতিমতো প্রেরণাসঞ্চারী রচনাও লিপিবদ্ধ করেছেন নিজ নিজ লেখনীমুখে। স্বদেশপ্রেম বস্তুটি মানুষের মধ্যে প্রকট বা অপ্রকট যে আকারেই হোক স্বাভাবিক ভাবে নিহিত থাকে—তাকে চাগিয়ে তোলবার জন্য বাইরের অঙ্কুশ তাড়নার প্রয়োজন হয় না। জাতীয়তার ধারণা একটা তাত্ত্বিক আদর্শ হিসাবে বাইরে থেকে চালান হয়ে আসতে পারে কিন্তু নির্মল দেশপ্রেমের আবেগ উপর থেকে চাপানো কোন বস্তু হওয়া সম্ভব নয়, ভিতরের স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদেই তার জন্ম।

একথা যে কথার কথা নয় তার প্রমাণ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিরোজিও, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেনের রচনাবলী। তাঁরা যখন দেশমাতৃকার বন্দনা গান করেছেন বিদেশী ভাবের বশ্যতায় বা পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধি হয়ে তা করেন নি, করেছেন অন্তরের সহজাত প্রেরণায়। ঈশ্বর গুপ্ত আমাদের দেশে বিলীয়মান পুরাতন তন্ত্র ও ইংরেজ অভ্যুদয়ের স্রোতমুখে ভেসে আসা আধুনিকতন্ত্রের যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি। তিনি যখন তাঁর দেশবাসীকে "বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুরকে পূজা" করবার জন্য আহ্বান

জানান, জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক প্রত্যয়ের প্রতি আনুগত্যবশতঃ তা তিনি করেননি, করেছেন অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত দেশপ্রেমের আবেগ বশতঃ। জনমানসে অনাবিল দেশপ্রেমের ভাবাবেগ সৃষ্টি করাই তাঁর এজাতীয় রচনার উদ্দেশ্য। রঙ্গলালের প্রসিদ্ধ কবিতার পংক্তি "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় / দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায় ?" এখনও আমাদের অন্তরে পুরাতন দিনের উদ্দীপনার স্মৃতি জাগিয়ে তোলে এবং আমাদের ভাববিহ্বল করে রাখে। এই রচনাটি বাংলা ভাষায় সহজাত দেশপ্রেমের অভিব্যক্তির একটি সুন্দর উদাহরণ। 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায়ের স্রষ্টা ডিরোজিও তাঁর একটি কবিতায় মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে তাঁর নতি জানিয়েছেন বড় চমৎকার ছন্দে ও ভাষায়। যদিও এটি ইংরেজী কবিতা তাহলেও এই প্রসঙ্গে ডিরোজিওর উল্লেখ করা হলো এই কারণে যে, তাঁর প্রবর্তিত ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর একটি মূল চালিকা শক্তিই ছিল স্বদেশপ্রেম এবং তাঁর বাঙ্গালী ভাব-শিষ্যরা সকলেই ছিলেন কম বা বেশী পরিমাণে দেশপ্রেমের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ। হেমচন্দ্রের বিখ্যাত কবিতা 'ভারত-সঙ্গীত' এবং নবীনচন্দ্রের বহুল অধীত কাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ' জাতীয় স্বাধীনতার আদর্শের গৌরববর্ধক ও দাসত্বের ধিক্কারবাক্যে পরিপূর্ণ আর দুটি সুন্দর রচনার উদাহরণ। বাংলা ভাষায় এ দুটি রচনার আবেদন কোন সময়েই মলিন হবার নয়।

অপরপক্ষে মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠ কাব্যসৃষ্টি 'মেঘনাদবধ কাব্য' সমুদ্রকল্লোলবৎ ধ্বনি সমৃদ্ধ ভাষায় ও গুরুগম্ভীর ছন্দে বিধৃত এক ধ্রুপদী রচনায় দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ আবেগ বহন করছে। যদিও মধুসূদন এই কাব্যে দেশপ্রেমের আদর্শের মহিমা কীর্তনের জন্য সামান্যই বাক্য ব্যয় করেছেন তা হলেও যে-ভাবে ও ভঙ্গীতে তিনি রামচন্দ্রের বাহিনী কর্তৃক লঙ্কাদ্বীপের আক্রমণ ও সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে লঙ্কার প্রতিরোধ ও পরিণামে তার পতন বর্ণনা করেছেন তাতে এই কাব্যটি মহত্তম আবেগ-প্রসূত একটি দেশপ্রেমের বিলাপকাব্য হয়ে উঠেছে। মধুসূদন রচনাটি

শুরু করেছিলেন আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় ও জাঁকালো ছন্দে। কিন্তু দেশ-প্রেমের অশ্রুনিষেকে শেষ পর্যন্ত তা হয়ে দাঁড়িয়েছে করুণ এক শোক-গাথা। ফলে চিরায়ত কাব্যের লক্ষণকে অবদমিত করে এই রচনায় বড় হয়ে উঠেছে গীতি-কবিতার আন্তরিক আবেদন। "স্বাধীনতাই জীবন, স্বাধীনতাই মানুষের ধ্যান, জ্ঞান, প্রাণ" এই হচ্ছে এই কাব্যের মূল ধুয়া।

দেশাত্মবোধক লেখকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রেষ্ঠ। যদিও তিনি মূলতঃ ঔপন্যাসিক ও স্রষ্টা, তাহলেও তাঁর অন্যতর ভূমিকা—মনস্বিতার ভূমিকাকেও কোনক্রমেই খাটো করে দেখা চলে না। প্রকৃত-পক্ষে তিনিই ছিলেন বাংলায় জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রণালীবদ্ধ তন্ত্রকার। তিনি ঋষি, তিনি জাতীয়তা যজ্ঞের হোতা। ১৯০৫ সালের সমসময়ে, আগে ও পরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রে বাংলায় যে-প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, যা কিনা সমগ্র দেশকে এক ভাবের প্লাবনে নিমজ্জিত করেছিল, তার পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী। এক হিসাবে দেখতে গেলে তিনি ভারতীয় জাতীয়তারও জনক। তাঁর বিবিধ রচনায় যে ভাবের বীজ উপ্ত হয়েছিল তাই ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হয়ে উঠল ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আত্মপ্রকাশের ঘটনায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত ১৮৭৬ সালের ভারত সভাকেও পরোক্ষভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের অব্যবহিত প্রভাবজাত ঘটনা মনে করা যেতে পারে। অবশ্য সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্র-চেতনার উদ্বোধনে মাৎসিনি, গ্যারিবল্ডী, কাভূর প্রমুখ ইতালীর স্বদেশপ্রাণ বীরদের প্রভাবের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল—সেকথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার প্রভাবে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত দেশাত্মিকা বুদ্ধির লক্ষণীয় উন্মেষ ঘটল। বিশেষ করে তাঁর উপন্যাস 'আনন্দমঠ' এবং লঘুচালের নিবন্ধধর্মী রচনা 'কমলকান্তের দপ্তর', যা কিনা ছিল বাংলা ভাষায় রম্যরচনার সর্বপ্রথম সার্থক উদাহরণ, এই প্রক্রিয়াকে দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে বাড়িয়ে তুলেছিল। জাতীয়তার ঋকমন্ত্র স্বরূপ 'বন্দেমাতরম' স্তোত্রটি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসেরই অঙ্গ। এই এক

সঙ্গীত, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণে সুমহান্ দেশপ্রেমের আবেগ সৃষ্টি করে তাদের গভীর শৌর্যে বীর্যে উদ্বুদ্ধ করেছে। বন্দেমাতরম গানের কলি মুখে নিয়ে কত দেশপ্রেমী বীর যুবক পুলিশের লাঠি-গুলির সম্মুখীন হয়েছেন ও হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছেন তার লেখাজোখা নেই। 'কমলাকান্তের দপ্তর' বইয়ে 'আমার দুর্গোৎসব' নামে যে রচনাটি আছে তাকে বন্দেমাতরম স্তোত্র-সঙ্গীতের পূর্বাভাস মনে করা যেতে পারে। এই দুই রচনায় বঙ্কিম দেবী দুর্গাকে মৃন্ময়ী মূর্তিরূপে উপাসনা করেননি, পরন্তু চিন্ময়ী এক সত্তারূপে আরাধনা করেছেন। তিনি দুর্গাকে স্বদেশভূমির সঙ্গে একাত্ম করে প্রকারান্তরে দেশ মাতৃকারই বন্দনা গান করেছেন। দেশের আকাশ-বাতাস, নদ-নদী, মাটি-পাহাড় বঙ্কিমের ধ্যানদৃষ্টিতে প্রাণময় সত্তায় বিধৃত হয়ে দেশবাসীর অন্তরের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমের আকুতিকে আকর্ষণ করে এনেছে। পরবর্তী-কালে অরবিন্দ ঘোষ (উত্তরকালের শ্রীঅরবিন্দ) বন্দেমাতরম আদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রবুদ্ধ হন। তিনি যে-ভবানী মন্দিরের পরিকল্পনা করেন তা আর কিছু নয়, তা বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃতত্ত্বেরই বিশদীকরণ মাত্র। বাংলার বিপ্লবীরা অরবিন্দের ভবানী মন্দিরের আদর্শে একান্ত-ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের কারণে শ্রেষ্ঠ আত্মবলিদানে প্রস্তুত হন। তাঁদের এই আত্মোৎসর্গের প্রেরণা প্রকারান্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষারই পরিণামফল মাত্র। আরও দুই দশক কাল পরে দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের জীবনাচরণে ত্যাগপূত দেশপ্রেমের আদর্শ বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে ওঠে এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠ আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রবন্ধ নিবন্ধে ছাড়াও বঙ্কিমের শেষ বয়সের কয়েকটি উপন্যাসে স্বদেশানুরাগের ব্যঞ্জনা এমন প্রবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করে যে, অরবিন্দ তাঁকে শুধু কবি বলেই ক্ষান্ত হননি, বলেছেন, তিনি দ্রষ্টা ও জাতি সংগঠক ('Seer and nation-builder')। উভয় ভূমিকাতেই বঙ্কিমের অবদান অত্যন্ত মূল্যবান।

আধুনিক ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলার আর এক

দিক্‌পাল লেখক, যিনি স্বদেশবাসীর জাতীয় চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রে ও আত্মমর্যাদার উদ্বোধনে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছিলেন। জাতীয় স্বাবলম্বন ও জাতীয় পুনর্গঠনের বিভিন্ন আন্দোলনে কবিগুরুর প্রভাব সর্বাতিশায়ী হয়ে দেখা দিয়েছিল এই কারণে যে, তাঁর গদ্য পদ্য সকল রচনাতেই আত্মবিশ্বাসের বাণী ওতপ্রোত হয়ে ছিল এবং আত্মজাগরণ অভীষ্ট লক্ষ্যের মত কাজ করেছে। বিশেষ, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে তাঁর গৌরবান্বিত ভূমিকা কোনমতেই ভোলবার নয়। এই সময়ের অগণিত গান ও প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে তিনি সর্বসাধারণকে স্বদেশীর চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন ও তাদের পরনির্ভরতা ত্যাগ করে স্বাবলম্বী হতে বলেছেন। তাঁর বিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ জাতিকে আত্মনির্ভর হবার জন্য উদাত্তকণ্ঠের আহ্বান-বাণীতে পরিপূর্ণ। এইরূপ আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ হল 'আত্মশক্তি', 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', 'রাজাপ্রজা', 'ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের ধারা' ইত্যাদি। এই প্রবন্ধনিচয়ের সব কটিতেই সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের প্রণোদনায় দেশসেবার ডাক দেওয়া হয়েছে। অন্যপক্ষে কবির অগণিত সংখ্যক স্বদেশী গানে দেশপ্রেমের প্লাবন বইয়ে দেওয়া হয়েছে বললেও চলে। স্বদেশী যুগে কত যে দেশাত্মবোধক গান তিনি লিখেছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। এই ক্ষেত্রে কবির ভূমিকা ছিল অনেকটা মধ্যযুগীয় রাজস্থানের চারণ-কবিদের অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানে আছে একদিকে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদার অনুশীলনের মাধ্যমে জাতীয় সম্বিত পুনরুদ্ধারের বাণী, অন্যদিকে ইংরেজ শাসনের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চেতনা। যে-বিদেশী শাসন জগদ্দল পাথরের মত আমাদের বুকের উপর ভার হয়ে চেপে আছে তার অপসারণের জন্য আন্দোলন করাই যথেষ্ট নয়, আমাদের আবেগ ও অভীপ্সাকে গঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টার খাতে পরিচালিত করাও সমান জরুরী —এই তাঁর সঙ্গীত ও প্রবন্ধাবলীর মূল বাণী। তিনি বিদেশীকে ঘৃণা করতে শেখান না পরন্তু পরশাসনের গ্লানিবোধে মর্মপীড়িত হবার শিক্ষা

দেন এবং সেই মর্মপীড়ার প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করেন। মোটকথা, বিদেশী শাসন ও শোষণের অবসান তিনি কামনা করেন ঠিকই তবে স্বাবলম্বনকেই ওই লক্ষ্যসিদ্ধির সর্বপ্রধান উপায়স্বরূপ মনে করেন।

কবির গণনাহীন স্বদেশী গানের মধ্য থেকে বাছাই করা এক কঠিন কাজ তবে ইতস্ততঃ কিছু গানের প্রথম কলি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে নমুনা হিসাবে। যথা, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি; সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে; বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল; ও আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা; আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী; ইত্যাদি।

কবির 'গোরা' উপন্যাস এক অবিস্মরণীয় রচনা। কাহিনীর বৈশিষ্ট্যেই যে উপন্যাসটি অনুপম তাই নয়, বক্তব্যের মহিমাতেও তার অনন্যতা সুপ্রকট। বইটিতে ঘটনার ধারায় প্রথমে জাতীয়তাবাদকে কাহিনীর কেন্দ্রমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে পরে আর ঘটনাবলীর স্রোত জাতীয়তার বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি, তা আন্তর্জাতিকতায় সমুত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এই উত্তরণের সিদ্ধিতেই গ্রন্থটি বিশেষ মাহাত্ম্য লাভ করেছে। তবে আন্তর্জাতিকতা এই বইয়ের মূল অভীষ্ট হলেও তার অন্তর্নিহিত দেশপ্রেমের আবেগকে কোনমতেই কিছু নয় বলে উপেক্ষা করা চলে না। গোরা বাংলা সাহিত্যে একটি দিক চিহ্ন স্বরূপ এবং সম্ভবতঃ বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

বাংলা ভাষায় জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাট্যের অভাব নেই। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' থেকে শুরু করে এই যুগের বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' ও 'জবানবন্দী' পর্যন্ত রচনা সমাজসচেতন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নাটকের এক সারিবদ্ধ মিছিল বলা যায়। প্রথম যুগের বাংলা নাট্যসাহিত্যে জাতীয়তার আধিক্য ছিল, পরে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সূচনায় রাষ্ট্রিক পরিস্থিতির বদল হওয়ায় জাতীয়তার ভাবকে পিছনে ফেলে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করে। নীলদর্পণ (১৮৬০) নীলকর

সাহেবদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদের নাটক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তার মূল সুর। নাটকের আক্রমণের লক্ষ্য নীলকর সাহেবরা হলেও প্রকারান্তরে তা ছিল ব্রিটিশ শাসনেরই বিরুদ্ধে প্রযুক্ত। সেই দিক থেকে এই নাটক একই সঙ্গে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করেছিল। তারপরে নীলদর্পণের দেখাদেখি একই উদ্দেশ্য নিয়ে আরও নাটক রচিত হয় গত শতকের সত্তরের দশকে। বিষয়বস্তুতে না হলেও নাম সাদৃশ্যে এগুলি নীলদর্পণের সগোত্র। যেমন, জমিদার দর্পণ, চা-কর দর্পণ, কেরানী দর্পণ ইত্যাদি। এই সময়ে আর যে সব জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক রচিত হয়েছিল তার মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকটি হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজনী', 'অশ্রুমতী' ও 'পুরুবিক্রম'; হরলাল রায়ের 'বঙ্গ-বিজয়ী', উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' ইত্যাদি। শেষোক্ত নামীয় নাটকটি বিশেষ উল্লেখ দাবী করে এই কারণে যে, এতে এক ইউরোপীয়ের হত্যা দেখানো হয়েছে (অবশ্য অকারণে নয়, এক নারীর উপর বলাৎকারের প্রতিশোধ নেবার জন্য) যার ফলে তদানীন্তন ইংরেজ প্রভুরা নাট্যকারের উপর ক্ষেপে যায় এবং তাঁকে কারাগারে পাঠাবার উদ্যোগ করে। বেচারা উপেন্দ্রনাথ দাস উপায়ান্তর খুঁজে না পেয়ে দেশ ছেড়ে পালান ও ইংলণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নেন। এই নাটক এবং আর দু-একটি নাটকের কারণেই শেষ পর্যন্ত ১৮৭৬ সালে 'ড্রামাটিক পারফর্মেন্স অ্যাক্ট' পাশ হয়, যে-আইনের লক্ষ্য ছিল যে কোন ধরনের দেশাত্মবোধক নাটকের কণ্ঠরোধ করা। স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত এই কালা কানুনটি বলবৎ ছিল।

তবে এই কালা কানুন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও আমাদের তৎকালীন নাট্যকারদের চিন্তার স্বাধীনতাকে পুরাপুরি দমিত করতে পারা যায় নি। তাঁরা কালা কানুনের বাধা নিষেধকে পাশ কাটিয়ে কোন না কোন ভাবে তাঁদের দেশপ্রেমের আকুতিকে অভিব্যক্তি দান করে চলেছিলেন তাঁদের নাটকের মধ্য দিয়ে। তা যদি না হতো গিরিশচন্দ্র ঘোষের ন্যায় এক অগ্রগণ্য নাট্যকার 'সিরাজদৌল্লা' ও 'মীরকাশিম'-এর মত দুটি জাতীয়-

ভাবোদ্দীপনাপূর্ণ ঐতিহাসিক নাটক লিখতে পারতেন না। এই দুটি সাহসিক নাট্যের উপর এক সময়ে সরকারী বাধা-নিষেধ আরোপিত হয়েছিল, পরে প্রত্যাহৃত হয়। অথবা, প্রসিদ্ধ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দেশপ্রেমমূলক ঐতিহাসিক নাটক যথা 'প্রতাপসিংহ', 'মেবার-পতন', 'দুর্গাদাস', 'তারাবাঈ' প্রভৃতি—এগুলিও রচিত হওয়া সম্ভব ছিল না। এ সকল রচনার সব কয়টিতেই জাতীয়তার উদার আহ্বান ধ্বনিত এবং পরবশ্যতার মর্মান্তিক গ্লানিবোধ পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের তিরোধানের পর বাংলার নাট্যক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে এই সব লেখকদের আবির্ভাব ঘটে—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, জলধর চট্টোপাধ্যায়, অয়স্কান্ত বক্সী, নিশিকান্ত বসু রায় ও অন্যান্য। এঁদের সকলেই কম-বেশী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দেশপ্রেমের নাটক লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। শচীন্দ্রনাথের 'গৈরিক পতাকা' একসময়ে প্রচুর দর্শক আকর্ষণ করেছিল। এটি একটি ঐতিহাসিক নাটক—মহারাষ্ট্রের বীর নায়ক ছত্রপতি শিবাজীর জীবন কাহিনী অবলম্বনে এর নাট্যবস্তু গড়ে উঠেছে। অন্যপক্ষে মন্মথ রায়ের 'কারাগার' কংস ও শ্রীকৃষ্ণর পৌরাণিক কাহিনীকে ভিত্তি করে রচিত হলেও আসল এটি একটি রূপক নাট্য। কংসের চরিত্রের আবরণে প্রকৃতপক্ষে ইংরেজের অত্যাচারী শাসক স্বরূপকে প্রকটিত করে তোলাই ছিল রূপকটির উদ্দেশ্য। সুতরাং নাটকটির উপরে অকারণে রাজরোষ আপতিত হয়নি। নাটকটির প্রচার নিষেধ হয়ে যায়। পরে অবশ্য এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়েছিল।

দেশপ্রেমমূলক নাটকের পাশে পাশে দেশপ্রেমমূলক কাব্যগ্রন্থও একাধিক রচিত হয়েছিল। এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত 'শিবাজী', 'পৃথ্বীরাজ' কাব্যগ্রন্থদ্বয়। গভীর স্বদেশপ্রাণতায় মণ্ডিত গদ্যগ্রন্থেরও অভাব ছিল না। এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে সবচেয়ে গৌরব দাবী করতে পারে সখারাম গণেশ দেউস্কর রচিত 'দেশের কথা' নামক বইখানি। এদেশে বৃটিশ রাজের অত্যাচারদুষ্ট

শাসন ও শোষণের তথ্যাশ্রয়ী বিবরণপূর্ণ এ বই একদা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে পঠিত হয়েছিল। দাদাভাই নৌরজী ও রমেশচন্দ্র দত্তের সমবিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থের আদলে লিখিত এই গ্রন্থখানি এমন সাড়া জাগিয়েছিল যে, ইংরেজ সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বইখানির প্রচার বন্ধ করে দেন। স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রত্যাশিতভাবেই বইখানার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে।

যে বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে তার বিবরণ পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না যদি না আমরা অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসখানির (১৯২৬) নাম উল্লেখ করি। বইয়ের নায়ক সব্যসাচী অসীম সাহস ও অতুলনীয় বুদ্ধিচাতুর্যপূর্ণ এক বিপ্লবী, যাঁর স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি অবিচল আনুগত্য ও তজ্জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগবরণের সদাপ্রস্তুতি চরিত্রটিকে এক অসামান্য মহিমায় মণ্ডিত করে তুলেছে। বিশেষ করে সব্যসাচী চরিত্রটির অনুধ্যানের জন্যই উপন্যাসখানি একদা বাংলার যুবসম্প্রদায়ের দ্বারা গীতা বা বাইবেলের মতই পরম শ্রদ্ধায় পঠিত হতো। বিপ্লবীরা সব্যসাচীর ক্রিয়াকলাপের ধরন থেকে তাঁদের কাজের হদিস পেতেন এবং সেইভাবেই নিজেদের কর্মকাণ্ড গড়ে তুলতে চাইতেন। বইয়ের গোড়া থেকে শেষ অবধি সব্যসাচীর প্রত্যেকটি উক্তির মধ্যে ইংরেজের প্রতি জ্বলন্ত ঘৃণা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। সুতরাং বইখানির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বইয়ের উপর রাজলাঞ্ছনার জয়টিকা প্রযুক্ত হয়। বইখানির প্রচার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। প্রবল জনমতের চাপে অবশ্য শেষপর্যন্ত ১৯৩৯ সালে বইখানার উপর থেকে নিষেধ-বিধি তুলে নেওয়া হয়।

শরৎচন্দ্র 'স্বদেশ ও সাহিত্য' নামে একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। বইয়ের অন্তর্গত 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রবন্ধটি বৈপ্লবিক অভীপ্সা প্রগতি চেতনা ও দেশপ্রেমের আকৃতির মানদণ্ডে একটি অবিস্মরণীয় রচনা মনে করা যেতে পারে।

রাজশেখর বসু : শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য

সুপ্রসিদ্ধ রসসাহিত্যিক রাজশেখর বসু 'পরশুরাম' এই ছদ্মনামেই সমধিক বিখ্যাত। তার কারণ পরশুরাম এই নামেই তিনি তাঁর রসসাহিত্যের ঝারি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন। তা বলে তাঁর স্বনাম রাজশেখর বসুও কম সার্থক নয়। কেন না তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক ও বিজ্ঞান ধর্মী সকল রচনাই তাঁর নিজ নামে প্রকাশিত হয়েছিল। অভিধান সংকলন, পরিভাষা প্রণয়ন, ভেষজ দ্রব্যাদির উপর পুস্তিকা সংরচন ইত্যাদি তাঁর বিজ্ঞান-ভিত্তিক রচনার কোঠায় পড়ে। এমনকি তাঁর রামায়ণ মহাভারত গীতা ইত্যাদির সারানুবাদও সম্প্রসারিত অর্থে শেষোক্ত শ্রেণীর সাহিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা চলে। কারণ যে গদ্যভঙ্গির প্রয়োগে তিনি তাঁর রামায়ণ-মহাভারত-গীতার অবয়ব গঠন করেছিলেন তার পরতে পরতে বৈজ্ঞানিক মেজাজের দ্যোতনা। বিজ্ঞান-নিষ্ঠ বিশ্লেষণপন্থী মন ছাড়া এমন গদ্যের জন্ম দেওয়া অসম্ভব।

আসলে পরশুরাম আর রাজশেখর বসু, রসসাহিত্য আর বিজ্ঞানভিত্তিক সাহিত্য দুই-ই একই ব্যক্তিত্বের, একই সৃষ্টিকর্মের এপিঠ-ওপিঠ ছিল। এক অবিভাজ্য, অখণ্ড সত্তার দুই ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি কিন্তু মূলে এক উপাদান। পরশুরামের কথাই ধরা যাক। এই নামাশ্রিত লেখাগুলিতেও বিজ্ঞানের মেজাজ স্পষ্ট। 'গড্ডলিকা' 'কজ্জলীর' গল্পগুলি হাস্যরসসৃষ্টির অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্বরূপ গণ্য হলেও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ওই সব গল্পের আধারে পরিবেশিত রস কোথাও উচ্ছ্বসিত নয়, উদ্বেলিত নয়, আগাগোড়া পরিমিত কথন দ্বারা সংযত, সংহত। একজন মিতব্যয়ী শব্দশিল্পী গল্পগুলির প্রকাশের বিস্ফার ও অতিরেককে কঠোর নিয়ন্ত্রণ বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন। তাই হাস্যরস এখানে অবারিত কৌতুকরসে পরিণত হতে পারেনি, বিনোদন প্রমোদ

বা আমোদে গিয়ে দাঁড়ায়নি। পরশুরামের দৃঢ়পিনদ্ধ সংযমশাসিত লেখার চাল তির্যক ব্যঙ্গে ও প্রচ্ছন্ন শ্লেষে বরাবর এমন এক উচ্চকোটির সৃষ্টি হয়ে রয়েছে যার রসাস্বাদনে হাসি আকর্ণ বিস্তৃত করবার প্রয়োজন হয় না, ওষ্ঠপ্রান্তে ফুল্লভাবের মৃদুমধুর উদ্ভাস ঘটালেই চলে। পরশুরাম-সাহিত্যের উপভোগ একান্তভাবেই নাগরিক মনোভাবাপন্ন পরিশীলিতরুচি বিদগ্ধ পাঠকের গ্রহিষ্ণুতার উপর নির্ভরশীল, গ্রামীণ রসপ্রবণতা দিয়ে একে আস্বাদন করা যাবে না।

এইখানেই তাঁর লেখার বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যের সূত্রটি নিহিত। বিজ্ঞানের সংযম, যাথাযথ্যপ্রীতি, শব্দব্যয়কুণ্ঠা, উচ্ছ্বাসবিমুখতা এগুলি সবই 'আরবেনিটি' অর্থাৎ নাগরিকতার পর্যায়ভুক্ত। পাঠক নগরমনস্ক না হলে তাঁর 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'বিরিঞ্চি বাবা' কিংবা 'কচি সংসদ' এর রস সঠিক ধরতে বা বুঝতে পারা যাবে না। 'চিকিৎসা সংকট' এর অনবদ্য চরিত্রসৃষ্টি তারিণী কবিরাজ যদি-বা কিঞ্চিৎ বোধ্য, 'স্বয়ংবরা' গল্পের 'ঠোঁটের সিঁদূর অক্ষয় হোক'-এর তত্ত্ব বুঝতে হলে বুদ্ধির শানে নাগরিকতার পালিশ অবশ্যই থাকা চাই। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পের গণ্ডেরীরাম বাটপারিয়া চরিত্রের সূক্ষ্ম শ্লেষ কিংবা 'কচি সংসদ' গল্পের শিহরণ সেন, দোদুল দে, বিগলিত ব্যানার্জী, লালিমা পাল (পুং) প্রভৃতি নামকরণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলেও কলকাতার মত রাজধানী শহরের হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেবার অভ্যাস থাকা উচিত। ওসব জিনিস গ্রামঘরের অনুষঙ্গে কল্পনা করা চলে না, উপভোগ করারও বোধ হয় বাধা আছে।

মেজাজ ও মানসিকতায় পরশুরামের সঙ্গে পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের একজন মাত্র হাস্যরসিক লেখকের যথার্থ তুলনা চলে। তিনি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। 'কঙ্কাবতী' 'ডমরু চরিত' প্রভৃতি রসরচনার অমর স্রষ্টা ত্রৈলোক্যনাথও ছিলেন স্বভাবে বিজ্ঞানী—ভারতের কৃষি সম্পদ কী করে উন্নয়ন ও বর্ধন করা যায় তৎপক্ষে উপযুক্ত গবেষণাকার্যে

ব্যাপৃত ছিলেন এবং এই বাবদে বিলাত পর্যন্ত গিয়েছিলেন। রাজশেখর বসুর মত রঞ্জনশিল্পেও (ডাইং) তাঁর অনুরাগ ছিল। উভয়েই জাতীয় শক্তির সদ্ব্যবহার, সামাজিক আচরণ ইত্যাদি নিয়ে চিন্তান্বিত ছিলেন। তবে তফাতের মধ্যে, পূর্বসূরী যেখানে উদ্ভট রস পরিবেশনায় বেশি যত্নবান ছিলেন, উত্তরসূরী সেইস্থলে অসূয়ালেশহীন স্মিত হাস্য বিতরণেই তাঁর লেখনীকে মুখ্যতঃ নিযুক্ত রেখেছিলেন। এ ছাড়া ত্রৈলোক্যনাথের লেখায় একটা রাশ-আলগা দেওয়া ছড়ানো-ছিটানো ভাব লক্ষ্য করা যায়, পরশুরাম কিন্তু খুবই স্বল্পবাক্, বিজ্ঞানের শাসনে আরও বেশি আত্মসংবৃত। সমাজের নানাবিধ মিথ্যাচার, ভণ্ডামি, অসাধুতা, ন্যাকামি প্রভৃতি নীতিগত ও আচরণগত বিচ্যুতিগুলিকে তিনি অবশ্যই আপসহীন সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখতেন কিন্তু তাঁর লেখার এমনই এক অনুচ্চকণ্ঠ মিতভাষী মৃদু ভঙ্গি ছিল যে, যখন সেই সব বিচ্যুতিকে বিবিধ ঘটনা ও চরিত্রের মোড়কে রূপ দিতেন, তখন তাঁর লেখায় কোনো জ্বালা প্রকাশ পেত না, অনাবিল শুভ্র হাস্যের আকারে তাঁর মনটি বিকীরিত হতে থাকতো। এইজন্য দেখা যায়, পরশুরাম সমাজ সচেতন হয়েও মূলতঃ হিউমারিস্ট হয়েই রইলেন, তাঁর কলমে স্যাটায়ারিস্টের লক্ষণ প্রকাশ পেল না। স্যাটায়ার থাকলে বোধ হয় তাঁর লেখা একালীন রুচির আরও সমীপবর্তী হতে পারতো।

পরশুরামের নাগরিকতা—'আরবেনিটি' একই সঙ্গে তাঁর শক্তিমত্তা ও দুর্বলতার কারণ ছিল। শক্তিমত্তার এই হেতু যে, এই সূত্রেই তাঁর লেখায় এসেছিল শিল্পের সুচিক্কণতা, সূক্ষ্মতা, পালিশ, রুচির পরিশীলন। ওই যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পরশুরামের প্রথম গল্প পড়েই তাঁর নিয়োগ-কর্তা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন—"আমি রস-যাচাইয়ের নিকষে আঁচড় দিয়ে দেখলাম আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।" —সে তাঁর লেখার এই বিদগ্ধ রসরসিকতার জন্যই, রচনার দেহ থেকে স্বভাব-বিচ্ছুরিত উজ্জ্বল স্বর্ণদীপ্তির জন্যই। কবি আরও এই

বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে—"এমন বিশাল মহীরুহ রাতারাতি কেমন করে সাহিত্য প্রাঙ্গণে দেখা দিল।"

সত্যই পরশুরামের বাংলা সাহিত্যের দরবারে আবির্ভাব আকস্মিকতার বিস্ময় মণ্ডিত, অপ্রত্যাশিতের চমকে ভরা। তিনি যখন সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করলেন তখন তাঁর বয়স বিয়াল্লিশ পেরিয়ে গেছে। এমন বয়সে যে কোনো সৃষ্টিশীল লেখকের খ্যাতির আকাশে মধ্যগগনের রৌদ্রচ্ছটা বিভাসিত হওয়ার কথা। আর সেই স্থলে এই লেখকের কিনা গগনমণ্ডলের এক কোণে প্রথম অভ্যুদয়। কিন্তু এর অর্থই হলো লোকচক্ষুর অগোচরে রাজশেখর বসু নামধেয় ব্যক্তিটির দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি—প্রস্তুতি শিক্ষার, অভিজ্ঞতার, মানবপর্যবেক্ষণের, নাগরিক শিল্পপ্রসাধনের। তিনি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রসায়ন বিদ্যার এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। তদুপরি বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্মাধ্যক্ষতার সূত্রে ব্যাপক সংগঠন দক্ষতা, পরিচালন নৈপুণ্য, মানব-অভিজ্ঞতার অধিকার লাভ করেছিলেন। এই সব বিবিধ কর্ষণা তাঁর শিল্পী মানসিকতার গঠনে অপরিহার্য উপকরণ-উপাদানের কাজ করেছিল। তবে প্রস্তুতির সবটা প্রক্রিয়াই নাগরিকতার লক্ষণ মণ্ডিত ছিল, চিন্তার ছাঁচটি মেট্রোপলিটান শহরের চার দেওয়ালের বৃত্ত দিয়ে ঘেরা ছিল—বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে সংস্পর্শ-জনিত উদার সহানুভূতির ভাবটি ওই মানসিকতার মধ্যে পাওয়া যায় না।

এইখানেই পরশুরাম সাহিত্যের দুর্বলতা। পরশুরামের লেখা মেট্রোপলিটান মন-মেজাজ প্রসূত, বাংলার বিস্তৃততর সম্প্রসারিত গ্রামজীবনের সঙ্গে ওই লেখার যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ বললেও চলে। এই সাহিত্য উচ্চশিক্ষাভিমানী বিত্তসচ্ছল তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যতটা ভোগ্য, সাধারণ শ্রেণীর পাঠকের তার একাংশও নয়। পরশুরামের গল্পের অভীষ্ট শ্লেষ, বিদ্রূপের তির্যক ইঙ্গিত, রসের সূক্ষ্মতা গড়পরতা বাংলা জানা পাঠকের বোধবুদ্ধি উপভোগের নাগালের বাইরে থেকে যাওয়ারই কথা। সাধারণ পাঠকের কাছে পরশুরাম সাহিত্যের

অনধিগম্যতা, ওই শ্রেণীর কাছে সেই সাহিত্যের আবেদন কমবেশী খণ্ডিত করে রেখেছে। এ একান্তভাবেই বুর্জোয়া সেব্য সাহিত্য, বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ও বিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট পর্বের সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত। ওই পর্বের পালা শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন নতুন পর্বের উদ্বর্তন হয়েছে।

এ ভিন্ন পরশুরাম-সাহিত্যের পরিধিটিও সংকুচিত বলে মনে হয়। শহর কলকাতার কতকগুলি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ ধরনধারণ কতকগুলি টাইপ-চরিত্রের চেনা আচার-আচরণ প্রায়শঃ তাঁর রচনার উপজীব্য তথা ব্যঙ্গের বিষয়ীভূত হয়েছে। এই টাইপ চরিত্রগুলির মধ্যে পড়ে অবসরভোগী বৃদ্ধ পেনশনার, পার্কে পার্কে সময় কাটাবার উদ্দেশ্যে সকালে বিকালে হাজির হওয়া বিশ্রম্ভালাপের আসর জমানো প্রৌঢ়-প্রবীণের দল, অসাধু ব্যবসায়ী, ন্যাকা তরুণ, প্রেমতৃষিতা তরুণী, ভণ্ড সাধু, অর্থগৃধ্নু চিকিৎসক, ইত্যাদি। এ কলকাতার সমাজের ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশের পরিচয় মাত্র বহন করে, এর সঙ্গে সংগ্রাম-মথিত উত্তাল-উতরোল প্রবলপ্রাণস্পন্দনময় ভিন্নতর আরেক কলকাতার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। রাজশেখর বসু নিজেই কবুল করেছেন—'কর্মক্ষেত্রে যাদের সঙ্গে মিশেছি তারা সব ব্যবসায়ী ও দোকানদার ক্লাস।' পরশুরাম অঙ্কিত কলকাতা মন্থর, জরাগ্রস্ত, রক্ষণশীল, পুরাতন মূল্যবোধের পশ্চাৎটান যুক্ত; এর মধ্যে অগ্রসর ধ্যানধারণা মণ্ডিত সম্মুখগতি বেগময় জীবনচঞ্চল কলকাতাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পরশুরামের স্বকীয় চিন্তার ধারায়ও রক্ষণশীলতার ছাপ প্রকট। বিজ্ঞানীর পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা, পারিপাট্যপ্রীতি, অনিয়ম বিমুখতা—তাঁর ব্যক্তিত্বের কয়েকটি চিহ্নিত সদ্‌গুণ কিন্তু ওই সূত্রেই আবার তিনি পরিবর্তন বিরোধী, স্থিতাবস্থার ধারক, নতুন কালের চিন্তাচেতনার মর্ম গ্রহণে অপারগ।

পরশুরামের সাহিত্যের যখন আমরা মূল্যায়ন করতে বসবো, তখন সামগ্রিক দৃষ্টিতেই সেই মূল্যায়ন করতে হবে। নয়তো একপেশে বিচার অবধারিত।

□ বাংলা সাহিত্যে গণসংযোগ □

বাংলা সাহিত্যে গণসংযোগের ঐতিহ্য খুব প্রবল নয়। গণসংযোগ বলতে বোঝায় নিপীড়িত শোষিত অবহেলিত শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে সংযোগ, তাদের সুখ-দুঃখ-ব্যথা-বেদনার অস্তিত্ব সম্পর্কে চেতনা ও সহানুভূতি। এই মানদণ্ডে বিচার করে দেখে বলতেই হয় এযাবৎ বাংলা সাহিত্যে গণসংযোগের সংস্কার খুবই ক্ষীণধারায় বহমান ছিল। কিছু-কিছু ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্ত বাদ দিয়ে সাধারণ ভাবে যদি বাংলা সাহিত্যের ধারা-ধরন লক্ষণাদির পর্যালোচনা করতে হয় তো এই সিদ্ধান্তে না এসে পারা যায় না যে বাংলা সাহিত্যের সংসারে এতকাল মধ্যবিত্ত মানসিকতারই দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রাধান্য ছিল, তার ফাঁক গলে যদি-বা কখনও গণসংযোগের উদাহরণের ছিটেফোঁটা চোখে পড়েছে তাকে নিয়মের ব্যত্যয়রূপেই গণ্য করতে হবে।

বাংলা সাহিত্যে এরকম ঘটবার কারণ এই যে, ইংরেজ শাসন এদেশে কায়েম হওয়ার পর বাংলায় যে সাহিত্যের অভ্যুদয় হয় তার মূল ছাঁচটা ছিল নাগরিক, বুর্জোয়া মূল্যবোধের দ্বারা কষিত। দেশে তখন সবেমাত্র বুর্জোয়া নাগরিক শ্রেণী গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে, ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শ প্রভাবে কলকাতা শহর ও তার আশপাশের অঞ্চলকে কেন্দ্র করে একটি নয়া বিত্তবান শ্রেণীর গোড়াপত্তন হয়েছে। তারা ইংরেজের ভাল-মন্দ বহুবিধ কর্মের সহযোগী এবং প্রধানতঃ রাজধানী শহরেই কেন্দ্রীভূত। ইংরেজের দৌলতে তারা কাঁচা পয়সার স্বাদ পেয়েছে এবং সেই সুবাদে ইংরেজের অনেক অভ্যাস বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণাকে রপ্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। সেই সূত্রেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে উচ্চ তথা মধ্যবিত্ত মানসিকতার উদ্ভব।

সমাজে বুর্জোয়া মূল্যবোধের স্ফুরণের ও আধিপত্যের কালে শ্রমিক-

কৃষকের জাগরণ বড় একটা লক্ষ করা যায় না। বাংলার সাহিত্যে ও সমাজে ঠিক এই অবস্থারই প্রতিফলন ঘটেছিল। উনিশ শতকের বাংলায় শ্রমিকশ্রেণী মোটে গড়ে ওঠবারই সুযোগ পায়নি, সাহিত্যে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ তো আরও অনেক পরের কথা। কৃষকশ্রেণী অবশ্য বাংলার গ্রামীণ সমাজের নিসর্গের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সেই হিসাবে বাংলা সাহিত্যে তার পদপাত যে না ঘটেছে এমন নয়। তবে এই পদপাত কৃষকের শ্রেণী-স্বার্থকোণ থেকে ঘটেনি, ঘটেছে ভূম্যধি-কারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে। বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় লালিত জমিদারদের মধ্য থেকে সাহিত্যের নায়ক নির্বাচিত হয়েছে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বাংলার সনাতন অত্যাচারিত কৃষককুলকে দেখানো হয়েছে জমিদার নায়কের হয় অনুগ্রহ নয় নিগ্রহের শিকার রূপে। প্রায়শঃ জমিদারী বদান্যতাটাই কাহিনীর মূল সুর। বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসে ও রবীন্দ্রনাথের একাধিক প্রবন্ধে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে। শরৎচন্দ্র অবশ্য ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর গল্পে-উপন্যাসে জমিদারদের শোষণমুখী নিষ্ঠুরতার রূপটিই বেশী ফুটিয়ে তুলেছেন।

জমিদারদেরও একটা বড় অংশ আবার 'অ্যাবসেন্টি ল্যাণ্ডলর্ড', গ্রামে অনুপস্থিত। নগরের ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাসের আকর্ষণে কলকাতায় সমাগত এবং সেখানে বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের নবধনিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলে শিল্প-সাহিত্যে-সংস্কৃতির পোষকতায় নিয়োজিত। তাঁদের আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রার ব্যয়নির্বাহের রসদ আসে গ্রামের চাষীর রক্তজল করা টাকায়, চাষী এদিকে বরাবরের মতই নিগৃহীত ও শোষিত হতে থাকে। রাজধানীতে বসবাসকারী গ্রামের জমিদার প্রজার সুখ-দুঃখে প্রায়শঃ উদাসীন। জমিদারদের সংগঠন আছে কিন্তু কৃষকদের কোন সংগঠন নেই। জমিদারশ্রেণী ও জমিদারশ্রেণীর সমস্বার্থ বিশিষ্ট সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে দাবী আদায়ের জন্য কৃষকদের কোন সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন নেই। সরকার কৃষকদের জন্য প্রজাস্বত্ব আইন তৈরী করতে লেগেছে অনেক পরে। আমরা যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে

প্রজাস্বত্ব আইনের অঙ্কুরোদ্গমও হয়নি বলতে গেলে। বিভিন্ন শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবানদের হাতে পড়ে পড়ে মার খাওয়াই তখন কৃষকশ্রেণীর মানুষদের বিধিনির্দিষ্ট নিয়তি ছিল বলা যায়।

এই যেখানে অবস্থা সেখানে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষদের সুখ-দুঃখের কথা মূলতঃ অনুপস্থিত থাকবে সে কথা বলাই বাহুল্য। কালে ভদ্রে এই শ্রেণীর লোকেদের দেখা পাওয়া যায়, তাও উচ্চশ্রেণীর মানুষদের পরিপূরক কিংবা অধীন চরিত্র রূপে, নিজেদের স্বতন্ত্র অধিকারের বলে নয়। বাংলা সাহিত্যে কৃষক সর্বদাই উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত।

এরকম অবস্থায় সাহিত্যে যে গণসংযোগ উপেক্ষিত হয়ে থাকবে সেকথা সহজেই বোঝা যায়। যে-সমাজে কৃষক-শ্রমিকের জাগরণ হয়নি বা তাদের শ্রেণীচেতনা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের রূপ পায়নি সে সমাজের সাহিত্যকর্মে গণসংযোগের কথা ভাবা যায় না। অভিজাত ও মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ শাসিত সাহিত্য সংসারে উপরতলার জীবনের ছবি বেশী ফুটে ওঠাই স্বাভাবিক। কার্যতঃ তা-ই হয়েছিল। কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র ও তৎপরবর্তী লেখকদের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত এবং কাব্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম ও প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখেরা লেখনী ধারণ না করা পর্যন্ত বাংলা ভাষায় গণসংযোগের সংস্কার তেমন দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। গণসংযোগের জন্য গণতন্ত্রের আবহাওয়া দরকার, দরকার সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার অনুকূল এক বাতাবরণের। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত এই দুই আদর্শের পদপাত আমাদের সমাজে কিংবা সাহিত্যে তেমন স্পষ্ট বা প্রবলভাবে শ্রুত হয়নি। তার আগে অবধি বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থের সূত্রে বাংলার সাহিত্য সৃষ্টিতে হয় উচ্চবিত্তের জয়মাহাত্ম্য নয় মধ্যবিত্তের বন্দনাধ্বনি উদগীরিত হয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তন হয় প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের ধাক্কায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড আলোড়ন-বিলোড়ন-বিক্ষোভ বাংলা সাহিত্যের গোটা পরিপ্রেক্ষিত-টাকেই বদলে দেয়। সমাজে ফুটে ওঠে অস্থিরতা, আর তার অনিবার্য

প্রভাব গিয়ে পড়ে বাংলা সাহিত্যের বিবিধ সৃষ্টিকর্মের উপর। কথা-সাহিত্যে আর কাব্যেই বেশী। কাব্যে আবির্ভূত হন কাজী নজরুলের মত গণদরদী কবি এবং যতীন্দ্রনাথের মত দুঃখবাদী কবি, আর কথাসাহিত্যে দেখা দেন কল্লোল সাহিত্যিক গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দ, যাঁদের লেখায় নিপীড়িত শোষিত শ্রেণীর মানুষের সুখদুঃখের কথা প্রথম বাংলা ভাষায় আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করল লক্ষণীয় রূপে। এতকাল সমাজের একেবারে শেষের ও নীচের কোঠায় বসবাসকারী অনাদৃত শ্রেণীর মানুষেরা সাহিত্যে কমবেশী অপাংক্তেয় ছিল; এখন থেকে সাহিত্যের দরদালানে তাদের জায়গা না হলেও সাহিত্যের উঠোনের পংক্তি ভোজে অন্ততঃ তাদের জন্য একটি কোণ নির্দিষ্ট হলো, যে অধিকার তারা আগে কখনও পায়নি। জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'যুবনাশ্ব' প্রমুখের গল্পোপন্যাসে নতুন একটা সুর শুনতে পাওয়া গেল, যাকে গণচেতনার আবাহনী সুর বলা যায়। পরে এই ধারা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের রচনায় আরও অনেক দূর সম্প্রসারিত হয়েছিল, তবে কল্লোলের লেখকেরাই যে তার নান্দী গেয়ে রেখেছিলেন তা একটা স্বীকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের মর্যাদা পেতে পারে।

আমরা লক্ষ করি যে, প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের শেষে, বিশের দশক থেকেই বাংলার রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন আন্দোলনের সূত্রপাত হতে থাকে, যার মূলে আছে গণজাগরণের ভিত্তি এবং যার অভিঘাত বাংলা সাহিত্যের তীরে এসেও ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ে। একদিকে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, অন্যদিকে নবগঠিত কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কিষাণ-শ্রমিকের আন্দোলন, তদুপরি জনমনের উপর রুশ বিপ্লবের সর্বব্যাপী প্রভাব বাংলার সমাজে ও সাহিত্যে এমন একটা নয়া আবহের সৃষ্টি করে, যার ফল হয় দূরপ্রসারী। কৃষক-শ্রমিকের অভাব অভিযোগ ও অধিকারের কথা ক্রমেই উত্তরোত্তর মাত্রায় সাহিত্যে জায়গা জুড়ে বসতে থাকে। এই প্রভাব বিস্তারের

প্রক্রিয়া শুধু যে কথাসাহিত্য আর কবিতায়ই সীমিত থাকে তা-ই নয়, নাটকেও সঞ্চারিত হয়। চল্লিশের দশকের রচিত 'নবান্ন', 'জবানবন্দী', 'তুখীর ইমান' প্রভৃতি নাটকই তার প্রমাণ। গণজাগরণ ও গণসংযোগের তত্ত্ব একটা প্রবহমান ভাবধারার মত ক্রমশঃ বাংলা সাহিত্যে আপন প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। কবিতায় নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের তুঃখবেদনা নজরুলের পরেই যাঁর কবিতায় সবচেয়ে সার্থক শিল্পরূপ লাভ করে তিনি হলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য, আর কথাসাহিত্যে এখন পর্যন্ত গণসংযোগের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হলেন রিয়ালিস্ট লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নাট্যক্ষেত্রে রচনার পর রচনায় গণজাগরণ-গণসংযোগের বাণী উত্তরোত্তর সোচ্চার রূপ লাভ করে চলেছে। এ ক্ষেত্রে একক ভাবে কোন নাট্যকারকে চিহ্নিত করার চেয়ে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস জনিত সারিবদ্ধ মিছিলের কথা বলাই ভাল।

আমি উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের রচনাকর্মাদিতে গণসংযোগের অভাবের কথা বলেছি। তবে গণসংযোগ বা গণচেতনার লক্ষণ যে একেবারে নেই তা-ও নয়। কিছু ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্ত আছে। যেমন মধুসূদনের 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটক। এটি একটি প্রহসন। এতে জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ হিন্দু-মুসলমান প্রজার মিলিত প্রতিরোধের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ইঙ্গিতটি স্পষ্টতঃই গণচেতনার স্বাক্ষরবাহী। প্রহসনের অন্যতম মূল চরিত্র হানিফ শেখ প্রজাবিদ্রোহের এক উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি। আর দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের তো কথাই নেই। নীলদর্পণ একাই একশো। এতে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তোরাপের চরিত্রটিকে দাঁড় করানো হয়েছে গণচেতনা ও গণপ্রতিরোধের এক শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিত্বমুলক নমুনা রূপে। সেই সঙ্গে সৌদামিনী, আতুরী প্রভৃতি নারী চরিত্র হলো খেটে খাওয়া মেহনতী স্তরের সাধারণ নারীর প্রতীক।

নীলদর্পণ নাটকে গণসংযোগ ও গণপ্রতিরোধের যে মহান আলেখ্যটি তুলে ধরা হয়েছে, তুঃখের বিষয় পরবর্তীকালের নাটকাদিতে আর সেই

ধারাটি তেমনভাবে অনুসৃত হয়েনি। অবশ্য এরকম হওয়ার অনেক কারণ ছিল,—ইংরেজের আরোপিত শাসনতান্ত্রিক বিধিনিষেধ কারণগুলির অন্যতম—তবে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসাবে এই তথ্য আমরা পাই যে, এই শতকের একেবারের চল্লিশের পাদকের আগে পর্যন্ত গণসংযোগের আর তেমন কোন সার্থক প্রতিচিত্রণ বাংলা নাটকে পাওয়া যায় না। অবশ্য বিগত শতকের সত্তরের দশকের মীর মশারফ হোসেন রচিত 'জমিদার দর্পণ' নাটকটির উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু এই নাটকে জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে উৎপীড়িত প্রজাসাধারণের বিদ্রোহ দেখানো হলেও নাটকটি মুদ্রিত আকারেই থেকে যায়, তৎকালীন বিত্ত ও কায়েমী স্বার্থবানদের বাধাদানের ফলে নাটকটির প্রকাশ্য অভিনয় হতে পারেনি। বঙ্কিমচন্দ্র কায়েমীস্বার্থের ধারকদের অন্যতম প্রতিভূ রূপে নাটকটির মঞ্চস্থকরণের বিরুদ্ধে এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, নাটক মঞ্চস্থ হলে চারদিকে আগুন জ্বলে উঠবে। লেখক হিসাবে বঙ্কিম জাতির একজন বরেণ্য পুরুষ হলেও, শ্রেণীস্বার্থচেতনা যে কত দুর্মর এ ঘটনা থেকে তারই শুধু প্রমাণ পাওয়া যায়। উদারতা, মানবতা প্রভৃতি গুণ মহদ্‌গুণ সন্দেহ নেই, তবে শ্রেণীস্বার্থের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সেই মহত্ত্বের চূড়ান্ত পরীক্ষা হয় না। শ্রেণীস্বার্থের পরীক্ষায় অনেক মহাত্মা ব্যক্তিকেই শেষ পর্যন্ত 'ফেল' মারতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রই একমাত্র অনুত্তীর্ণ ব্যক্তি নন—আরও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখানো চলে।

অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের পরাণ মণ্ডলকে নির্যাতিত কৃষকের এক প্রতীক স্বরূপ মনে করেন এবং সেই নজীরে বঙ্কিমকে কৃষকশ্রেণীর বন্ধু আখ্যা দিতে চান। এই বিশ্লেষণ পুরাপূরি ঠিক নয়। বঙ্কিম হয়ত কৃষকশ্রেণীর বন্ধু ছিলেন কিন্তু তার চেয়েও তিনি বড় বন্ধু ছিলেন জমিদারদের, যাঁদের তিনি স্বশ্রেণীর অন্তর্গত বলে মনে করতেন। জমিদারদের বদান্যতা, প্রজাহিতেচ্ছা, বিদ্যোৎসাহিতা প্রভৃতি গুণের কীর্তনে বঙ্কিম তাঁর রচনায় প্রায়শঃ পঞ্চমুখ হয়েছেন। উৎপীড়কের

প্রশংসা আর উৎপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি এক সঙ্গে চলতে পারে না। একই নিঃশ্বাসে গরম আর ঠাণ্ডা হাওয়া বওয়ানোর মতই সে জিনিস অসম্ভব। বঙ্কিমের চিন্তায় এই রকমের স্বতোবিরোধ আরও একাধিক ছিল। যেমন তিনি জাতীয়তারও প্রচারক, আবার একই সঙ্গে ইংরেজেরও প্রশস্তিকারক। ইংরেজের মহিমা কীর্তন করে দেশের লোককে ইংরেজের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে বলা বিপরীত ভাবনার এক মোক্ষম দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্র-রচনায় গণসংযোগের দৃষ্টান্ত কম। তবে কিছু ছোটগল্পে (যেমন, "সমস্যাপূরণ", "শাস্তি" প্রভৃতি গল্পে), নাটকের জনতা চরিত্র-গুলির রূপায়ণে এবং শেষ বয়সের কিছু কবিতায় ("বাঁশী", "ওরা কাজ করে", "ঐকতান" প্রভৃতি) গণচেতনার সুস্পষ্ট আভাস মেলে। কবির মধ্যবয়সের রচিত "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটি ইতিমধ্যেই একটি ক্লাসিক দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলির অনুষঙ্গে গণচেতনার স্বাক্ষর মেলে নিম্নলিখিত উদাহরণগুলির মধ্যে—"বিলাসী" ছোটগল্পের বিলাসী চরিত্র, "মহেশ" গল্পের গফুর ও আমিনা চরিত্র, "অভাগীর স্বর্গ" গল্পের কাঙালীর মা ও কাঙালী চরিত্র; 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের আকবর লাঠিয়াল ও পীরপুরের মুসলমান প্রজাবৃন্দের চরিত্র; 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের হরিহর সর্দার ও সাগর সর্দার লাঠিয়ালের চরিত্র; 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বের মধু ডোম, সতীশ ডোম প্রভৃতির চরিত্র, ইত্যাদি।

শরৎ-উত্তর সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও ছোট-গল্পগুলিতে গণচেতনার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই খাতে তাঁর সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক উপন্যাস হলো 'পদ্মানদীর মাঝি', 'শহরতলী', 'দর্পণ' প্রভৃতি উপন্যাস ও শেষ বয়সের লেখা গল্পগুলি (যেমন, "মাসীপিসি", "পেটব্যথা", "ছিনিয়ে খায় না কেন, "শিল্পী", "ছোট-বকুলপুরের যাত্রী" প্রভৃতি)। মানিকের রচনায় গণচেতনা ও গণ-

সংযোগের বিষয়ে লিখতে হলে স্বতন্ত্র আলোচনার দরকার, এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে তেমন চেষ্টা না করাই ভাল।

সাহিত্যে গণচেতনার আর একটি নিদর্শন হলো সতীনাথ ভাদুড়ী-কৃত 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের দুই খণ্ড। উত্তর বিহারের জিরানিয়া টোলের তাৎমাটুলি বস্তির ধাঙড়-বালক ঢোঁড়াইয়ের জীবন-কাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য। বইটি জনজীবনের উপাদান-উপকরণের এক অফুরন্ত খনিবিশেষ।

সমাজ প্রবাহে সাহিত্য

সাহিত্য সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত, সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না—এ সব কথা এতই পুরনো যে আজ প্রায় সেগুলিকে আপ্তবাক্যের পর্যায়ে ফেলা যায়। সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের অন্তরঙ্গ যোগ তো থাকবেই, তার আর নতুন কথা কি। কিন্তু যে কথাটা নতুন তা হলো, সমাজ বলতে তো একটা বৃহৎ-ব্যাপক অনির্দেশ্য সত্তা বোঝায়, তার সবটাকেই কি সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হবে? নাকি, তার একটা বিশেষ অংশকে সমাজের বিশাল অবয়ব থেকে আলাদা করে নিয়ে তাকেই একান্তভাবে সাহিত্যের উপজীব্য করে তুলতে হবে? বিশেষ, আজকের সাহিত্যে যখন চারদিকে বিভিন্ন শ্রেণীগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত চরমে উঠেছে, সমাজ থাকে-থাকে ভাঁজে-ভাঁজে বিভক্ত হয়ে গিয়ে তার পূর্বতন নির্বিশেষত্বের লক্ষণ হারিয়ে ফেলছে, থাকগুলির ভিতর উচ্চ-নীচের, বড়-ছোটর ভেদরেখা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত বেশী স্পষ্ট?

এই প্রশ্নটা নতুন, প্রতিটি আধুনিক লেখকেরই এই প্রশ্নটির জবাব-দহি করার একটা দায় আছে।

আমাদের বাংলা সাহিত্যের পুরাতন অধ্যায়ে দেখতে পাই ধর্ম ছিল ওই সাহিত্যের আষ্টেপৃষ্ঠে লেপ্টানো। বাংলার গোটা প্রাচীন ও মধ্য-যুগের সাহিত্য ধর্মকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস থেকে পৃথক করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কথা চিন্তাই করা যায় না তার কারণ ওই যুগে দেশের লৌকিক ধর্ম আর সমাজধর্ম প্রায় অভিন্ন ছিল। ধর্মই তখন সমাজের স্থান গ্রহণ করেছিল।

পরে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। ইংরেজ আসার পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপ বদলায়, বাংলা কাব্য ধর্মের খোলস ছেড়ে অনেক বেশী ইহমুখী আর মানবিকতার গুণ সম্পন্ন হয়, ধর্ম ক্রমশঃ জাতীয়তাবাদী

চেতনাকে পথ ছেড়ে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায়। সব দেশেই দেখা যায় জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজমের জাগরণের সঙ্গে মধ্যবিত্তের জাগরণের একটা নিকট-সম্পর্ক। অথবা কথাটাকে এইভাবে বললে আরও ভালভাবে প্রকাশ হয়, মধ্যবিত্তরাই সমাজ প্রবাহের ভিতর জাতীয়তাবাদী আদর্শকে ডেকে নিয়ে আসে। আমাদের দেশেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ও সমাজের দিকে এক নজর চোখ বুললেই এই কথার সারবত্তা উপলব্ধি করা যাবে। উনিশ শতকের বাংলাদেশে রঙ্গলাল, মাইকেল, হেম-নবীন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ যেসব দিক্‌পাল সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে তাঁরাই আসলে বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তার ভগীরথ—বাংলা ভাষার খাত বেয়ে কি গদ্যে কি পদ্যে দেশপ্রেমের অমৃতনিস্যন্দিনী ধারা বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তদুপরি বুর্জোয়ারা অর্থাৎ উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা সব দেশেই সাহিত্যের অনুষঙ্গে গদ্যভাষার স্রষ্টা, এখানেও সাহিত্যের একই নিয়ম কাজ করেছে—উনিশ শতকের বাংলায় এক বিশাল-বিপুল গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে আমরা দেখতে পাই, যার মূল ভিত্তি যুক্তিবাদ, ন্যাশনালিজম, ইংরেজ অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী সাহিত্যের মত ধর্মমোহ কিংবা অতিপ্রাকৃতবাদ নয়।

কিন্তু মনে রাখতে হবে এই সাহিত্যে ঐহিকতা ধর্মীয়তার স্থান গ্রহণ করলেও, তার প্রকৃত রূপের কিন্তু বদল হয়নি। পূর্বযুগের সাহিত্য ছিল রাজন্যতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল, কবিরা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার আশায় কোন না কোন রাজা কিংবা নবাব কিংবা সামন্ত সর্দারের স্তুতি গাইতেন; আর ইংরেজ শাসনের পরিবর্তিত অবস্থায় নতুন কালের লেখকেরা হয় ইংরেজ সরকারের মহিমা কীর্তনে নয় তো ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার গুণগানে মুখর হলেন। অঙ্গুলিমেয় উজ্জ্বল কতিপয় ব্যতিক্রম বাদ দিলে উনিশ শতকের অধিকাংশ বাঙালী লেখকই সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছেন এবং ইংরেজ শাসনের কল্যাণকারিতার পক্ষে ওকালতি করেছেন। বুর্জোয়া মানসিকতার ধর্মই এই যে,

বুর্জোয়ারা তাঁদের শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজস্বার্থকে অভিন্ন মনে করেন এবং সাহিত্যে ওই ভাবধারাকেই গোটা দেশবাসীর ভাবধারা বলে চালান। সমাজ এঁদের হাতে এঁদেরই শ্রেণীস্বার্থের প্রতিবিম্ব হয়ে দাঁড়ায় এবং যে দেশের অধিকাংশ মানুষ লেখাপড়ার সুযোগ বঞ্চিত তাদের এই উপায়ে সহজেই ধোঁকা দিতে পারা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা জাতীয়তার ঋত্বিক বলে পূজা করি এবং ঋষির সম্মানে ভূষিত করি। কিন্তু তিনি যেভাবে তাঁর প্রসিদ্ধ 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ইংরেজ শাসনের অনুকূলে যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন তাতে তাজ্জব বনে যেতে হয়। তিনি নিশ্চয়ই একজন সুযোগ্য হাকিম ছিলেন, ইংরেজ সরকারের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরূপে তাঁর ব্যক্তিত্বও নিশ্চয়ই ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠার সমানুপাতিক। কিন্তু রায়বাহাদুর ও সি. আই. ই. উপাধি কি তিনি সেজন্য পেয়েছিলেন? মনে হয় না। বরং আমাদের অন্যরূপ ভাবার কারণ আছে। এদেশে ইংরেজ শাসনের অনুগত একটি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়ে তুলতে তিনি যেরূপ অকুণ্ঠচিত্তে ও সোৎসাহে তাঁর লেখনীর শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন তারই পুরস্কার তাঁর ওই দুই সরকারী খেতাব। বৃথা তিনি ইংরেজের সেবা করেননি।

আরও বেশী ধাঁধার সৃষ্টি হয় 'নীলদর্পণ' নাটকের অতুলনীয় স্রষ্টা দীনবন্ধু মিত্রের 'রায়বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্তিতে। নীলদর্পণ নাটকের রচয়িতা রূপে দীনবন্ধুর ইংরেজবিরোধী ভূমিকা আর এই সরকারী সম্মানচিহ্নের আবরণে কলঙ্ক-লাঞ্ছনের অভিজ্ঞান—এই দুইয়ের ভিতর কোনমতেই সামঞ্জস্য করা যায় না। তেলে-জলে যেমন মিশ খায় না, এই দুইয়ের মধ্যেও মিশ খাওয়ানো কঠিন।

আসলে ইংরেজ শাসক ও বণিকের ক্রিয়াকলাপের সহায়ক রূপে এদেশে যে বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই মুৎসুদ্দী শ্রেণীর লোকগুলির শ্রেণীচরিত্রের মধ্যেই ছিল দোদুল্যমানতার দ্বন্দ্ব। তাঁদের বাইরের সঙ্গে ছিল তাঁদের ভিতরের বিরোধ। তাঁদের ঘোষণার সঙ্গে তাঁদের কাজের মিল ছিল না। "বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের বৃহত্তম সুখ"

—এর তত্ত্ব তাঁরা প্রচার করেছেন, কিন্তু কার্যতঃ বৃহত্তম মানুষের সুখ বলতে বুঝিয়েছেন শহরে বসবাসকারী ইংরেজী শিক্ষিত ও ইংরেজের বশংবদ স্বশ্রেণীর এক সম্প্রদায়ের সুখ। গ্রামে-গাঁথা এই বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে যে ব্যাপক জনসমাজের অধিষ্ঠান, তাদের সঙ্গে ইংরেজের প্রশ্রয়পুষ্ট এই নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত সমাজের কোন যোগ ছিল না, একমাত্র ভক্ষ্য-ভক্ষকের যোগ ছাড়া। কেননা এই শ্রেণীর নাগরিকদের রসদের একটা বড় অংশই আসত গ্রামের জমিজিরাত থেকে আর সেই আহরণের প্রক্রিয়াটি ছিল শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

খতিয়ে দেখতে গেলে এঁদের যুক্তিবাদটাও ছিল আত্মপ্রবঞ্চনাকর। মধ্যযুগসুলভ ধর্মীয় দৈবী মহিমাকে এঁরা এঁদের মনোভাব থেকে বিদায় দিয়েছিলেন সত্য কথা কিন্তু তার জায়গায় বসিয়েছিলেন যে-মানবতাকে, তার দেশের মাটিতে কোন শিকড় ছিল না। ইউরোপ থেকে ধার-করা এই মানবিকতা একান্তভাবেই ব্যক্তি-আশ্রয়ী ছিল ঃ অর্থাৎ নিছক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ধারণাকে আশ্রয় করে এই মানবিকতা স্ফূর্তি ও বিকাশ লাভ করতে চেয়েছিল, তার প্রভাব-সীমার ভিতর সমষ্টির কোন স্থান ছিল না। সমষ্টিকে বাদ দিয়ে ব্যষ্টির সুখ, ব্যষ্টির উৎকর্ষ এইটেই যখন বড় হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা নিতান্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়ায়। সমাজের কিছু সংখ্যক লোকের চূড়ান্ত ব্যক্তিগত সুখ-সমুন্নতি দিয়ে কি হবে, যদি সমাজের বেশীর ভাগ লোকেরই দুঃখ-দুর্দশার অবসান না হয়? আমাদের উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত লেখকেরা তাঁদের কাব্য ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে-মানবিকতার চর্চা করেছিলেন তা যুক্তিভিত্তিক হলেও ব্যক্তিসাক্ষিক (individualistic) মানবতার ঊর্ধ্বে তা কখনও উঠতে পারেনি—তাঁরা তাঁদের রচনায় সমষ্টি কল্যাণের আদর্শের মধ্যে যে-মানবিকতার অবস্থান, তাকে আবাহন করে আনতে শোচনীয়ভাবেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁদের শ্রেণীস্বার্থই এ ব্যাপারে তাঁদের বিরুদ্ধে বাদ সেধেছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মজ্জাগত ধর্মচেতনা আধুনিক

কালের পরিসীমায় এসে জাতীয়তায় ও মানবতায় রূপান্তরলাভ করেছে এটাকে দৃশ্যতঃ চেতনার অগ্রচারিতা ও প্রগতিমুখী ঝোঁক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্যায়-অত্যাচারে ভরা অসাম্য ও বৈষম্য-পীড়িত প্রচলিত সমাজ-কাঠামোর শোষণের যদি অবসান না হয় তাহলে ধর্মীয়তাই কি আর জাতীয়তাই কি ! একটি প্রত্যয় আরেকটি প্রত্যয়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে বলেই যে সমাজের সার্বিক উন্নতি সাধিত হয়েছে এমন মনে করবার কোন হেতু নেই। দেখতে হবে সমাজে প্রকট শ্রেণী-দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে কিনা আর সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে কিনা। শ্রেণী-দ্বন্দ্বের একটা প্রধানলক্ষণ সাধারণ মানুষের জাগরণ ও অধিকার সচেতনতা। এই মানদণ্ডে বিচার করে বলতেই হয় যে, উনিশ শতকে আমাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রখর শ্রেণী-দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়নি, সুতরাং তদানীন্তন সাহিত্যও ওই প্রভাবের অনুক্রমণ থেকে বঞ্চিত থেকেছে।

বাংলা সাহিত্যে সত্যিকার শ্রেণী-দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে বিশ শতকে, আর তা-ও প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়কাল থেকে ও তার পরে। কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ঘটনার অভিঘাতে এই সময়ে এদেশের অধিবাসীদের চিন্তা ও চেতনার মোড় ঘুরে যায়, তার মধ্যে ১৯১৭ সালের সোভিয়েট বিপ্লব প্রধান। রুশ বিপ্লবের বিশ্বব্যাপী প্রভাবের তরঙ্গ অনিবার্যভাবেই এদেশের মানুষের মনের তীরে এসে প্রবল ঘা দেয়, তাতে তার চৈতন্যের গড়ন বদলে দেয়। অবধারিত ভাবে এর প্রতিক্রিয়া বাংলা সাহিত্যেও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বলা যেতে পারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব বাংলা সাহিত্য আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের ভিতর দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে আসমান-জমিন ফারাক। দুই কালের সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে বিভেদ-রেখাটি এত স্পষ্ট যে অতিশয় স্থূলদর্শী পাঠকের চোখেও ওই পার্থক্যটি ধরা পড়বে। আমি কি বলতে চাইছি তা উনিশ শতকের শেষ তিরিশ বছরের মধ্যে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা সমূহ (যথা, 'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার', 'সাধারণী', 'বালক', 'ভারতী', 'সাধনা')

এবং বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা (যথা, ‘নবপর্যায় বঙ্গদর্শন’, ‘প্রবাসী’) একদিকে আর অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালের সমসময়ে ও পরে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা (যথা, ‘সবুজপত্র’, ‘ধূমকেতু’, ‘নবপর্যায় ভারতী’, ‘লাঙল’, ‘গণবাণী’, ‘কালিকলম’, ‘কল্লোল’, ‘প্রগতি’, ‘পরিচয়’, ‘পূর্বাশা’)—এই দুই জাতের পত্রিকাগুলির মনোভঙ্গী বিচার করলেই বোঝা যেতে পারে। প্রথম পর্বের পত্র-পত্রিকাগুলিতে ঝোঁকের তারতম্য অনুযায়ী সব কয়টিতেই কমবেশী জাতীয়তার ঘোষণা ; দ্বিতীয় পর্বের পত্র-পত্রিকাগুলির সুরে পাই নীচুতলার মানুষের দুঃখময় জীবন সম্বন্ধে চেতনা ও সহানুভূতির আভাস, আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনার স্বাদ, শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের সমস্যার বিষয়ে অবহিতি, সর্বোপরি প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের দ্যোতনা। দুই ধরনের মানসিকতায় দুস্তর ব্যবধান বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আলোড়ন সৃষ্টিকারী, বিপর্যয়কর করাল অভিজ্ঞতাসমূহই যে এই প্রকাণ্ড ব্যবধান সৃষ্টির কারক তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

কেউ কেউ বলতে পারেন পত্র-পত্রিকার সাহায্যে কি আর একটা গোটা দেশের মানসিকতার স্বরূপ ধরতে পারা যায়? দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক ঘটনাবলী, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—এগুলিরও কি হিসাব নেওয়া এক্ষেত্রে সমান জরুরী নয়? তার উত্তরে বলব, গোটা দেশের পরিস্থিতি বুঝতে নিশ্চয়ই জরুরী, তবে সাহিত্যের বিশেষ পরিস্থিতি বোঝবার পক্ষে পত্র-পত্রিকার সাক্ষ্য খুবই নির্ভরযোগ্য গণ্য করা যেতে পারে। সাহিত্যের সংসারে কখন কি হাওয়া বইছে, হাওয়ার গতি কোন্ দিকে বহমান, পত্র-পত্রিকাগুলিকে তারই নির্ধারক মনে করা যেতে পারে। সাময়িক পত্র-পত্রিকা সাহিত্যের আন্দোলনসমূহের গতি-প্রকৃতির ব্যারোমিটার স্বরূপ। কোন একটা বিশেষ স্থিতিতে, বিশেষ মুহূর্তে, সাহিত্যের আবহ নিরূপণের পক্ষে ওই যন্ত্রের তুল্য উপযোগী হাতিয়ার আর কিছু নেই।

বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বলা যায় প্রথম

বিশ্বমহাযুদ্ধের পরের দশক থেকেই বাংলা সাহিত্যে নির্যাতিত-শোষিত স্তরের মানুষের আবির্ভাব ক্রমশঃ সোচ্চার হয়ে উঠতে লাগলো। উত্তরোত্তর মাত্রায় শ্রমজীবী মানুষের পদপাতে বাংলা সাহিত্যের আঙিনা ভরে উঠতে লাগলো। আকাশে-বাতাসে খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষের দাবীর ঘোষণা, অধিকারের উচ্চারণ। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ জেগে উঠেছে তারই নিশানা বাংলা সাহিত্যের ভাবধারায় পরিস্ফুট—কখনও প্রত্যক্ষে, কখনও পরোক্ষে। পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল শ্রেণীগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আলোড়ন যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশে একটা অলঙ্ঘনীয় সামাজিক সত্যের রূপ পরিগ্রহ করতে আরম্ভ করেছে ক্রমেই প্রকটতর মাত্রায়। এবং তারই অনিবার্য ছাপ পড়লো সেই সময়কার সাহিত্যসৃষ্টির উপর।

একথা অবশ্য সত্য যে, কল্লোল-কালিকলম প্রভৃতি পত্রিকায় নীচুতলার মানুষের প্রতি দরদের যে অভিব্যক্তি দেখতে পাই তার সবটাই আন্তরিকতাপ্রসূত ছিল না, তার মধ্যে ভঙ্গীরও একটা ভূমিকা ছিল। ভঙ্গীর অর্থাৎ নকল প্রীতির, শোষিত স্তরের মানুষের জন্য সহানুভূতির exhibitionism এর। অর্থাৎ আমরা নয়া প্রজন্মের লেখকেরা সমাজের উঁচুতলার মানুষের স্বার্থের কথা না ভেবে নীচুতলার মানুষের জন্য ভাবছি, জাতপাতের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে তাদের সাহিত্যের আসরে পংক্তিভুক্ত করে তুলছি এই অভিমানের। কল্লোলের লেখকগোষ্ঠীকে শ্রেণীদ্বন্দ্ব-সচেতন বললে তাঁদের অতিরিক্ত সম্মান দেখানো হয়, তাঁদের বেশীর ভাগই ছিলেন মূলতঃ মধ্যবিত্ত মানসিকতার অঞ্চলধৃত, শুধু যুগের হাওয়া অনুযায়ী কিছুটা নীচুতলার দিকে ঝুঁকেছিলেন এইমাত্র বলা যায়। একথার ব্যতিক্রম স্বরূপে একমাত্র কাজী নজরুল ইসলামের নামোল্লেখ করা যায়, আর সহযাত্রীরূপে শৈলজানন্দের নাম কিছু পরিমাণে করা যায়। কিন্তু নজরুলকে তো কল্লোল একান্তভাবে তাঁদেরই লোক বলে দাবী করতে পারেন না, নজরুলের ভাবদীক্ষা হয়েছে তারও কয়েক বছর আগে, কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ ও কমরেড আবদুল হালিম প্রমুখের

সাহচর্যে এবং 'ধূমকেতু', 'লাঙল', 'গণবাণী' প্রভৃতি বামপন্থী পত্রিকার লালনক্ষেত্রকে আশ্রয় করে। নজরুলের প্রতিভা একান্তভাবে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের চেতনা প্রসূত প্রতিভা—প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের স্বাভাবিক স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায় তাঁর প্রতিটি রচনায়। অত্যাচারী শোষক বঞ্চক শ্রেণীর প্রতি সুতীব্র ঘৃণা আর অত্যাচারিত শোষিত বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষের প্রতি অপরিমেয় সমবেদনায় তাঁর কাব্য বাংলা সাহিত্যের এযাবৎ প্রচলিত মধ্যবিত্ত সংস্কার থেকে একেবারেই ভিন্নপথে বাঁক নিয়েছে এবং গণজীবনের অভিমুখী হয়েছে।

গণজীবনের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সাধনার সেই শুরু। বাংলা সাহিত্যের আধারে বৃহৎ-ব্যাপক বিপুলসংখ্যক জনমানুষকে নিয়ে একত্র চলবার প্রক্রিয়ার সূত্রপাত নজরুলকে দিয়েই প্রথম আরম্ভ হলো এ এক ঐতিহাসিক সত্য। এযাবৎ সমাজকে একটি বিশেষ সংকীর্ণ গোষ্ঠীর স্বার্থের সঙ্গে একীভূত করে সেই গণ্ডীবদ্ধ গোষ্ঠীস্বার্থকেই সমগ্র সমাজের স্বার্থ বলে চালাবার একটা পরিকল্পিত প্রয়াস চলে আসছিল। মধ্যযুগে ছিল সামন্তবাদের সঙ্গে সমাজের সমীকরণ, আর ইংরেজ অভ্যাগমের পরবর্তী কমবেশী দেড়শো বছর কালসীমার মধ্যে হয়েছিল বুর্জোয়া (উচ্চ ও মধ্যবিত্ত) সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমাজের সমীকরণ। এই কৃত্রিম সমীকরণের বাতাবরণের মধ্যেই মাইকেল, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি দিক্‌পাল কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকারদের উদ্ভব ও বিকাশ। তাঁদের প্রত্যেকেরই প্রতিভা অসামান্য, দু-একজনার অলোকসামান্য; কিন্তু তাঁদের প্রতিভার অসামান্যতা স্বীকার করেও একথা কোনক্রমেই ভুলে থাকা চলে না যে, তাঁদের সকলেরই প্রতিভা যাঁর যাঁর কালের বিশেষ শ্রেণী চেতনার দ্বারা সীমিত ও গণ্ডীরেখাবদ্ধ ছিল। যতবড় প্রতিভাবান মানুষই কেউ হোন না কেন, তাঁর পক্ষে স্বকীয় কালের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যবিত্ত সমাজ-সংস্কারকে নজরুলই প্রথম সজোরে

আঘাত হানলেন। তারপর তাঁরই প্রদর্শিত রেখাচিহ্ন অনুসরণ করে পরবর্তীকালে উদয় হলো কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও কাব্য সাহিত্যে সুকান্ত ভট্টাচার্যের। এই দুই সমাজ সচেতন, শ্রেণী-দ্বন্দ্বের তত্ত্বে পূর্ণসমর্পিতবিশ্বাস প্রতিভাধর শিল্পী নজরুলের ধারাকে আরও অনেকদূর সম্প্রসারিত করে নিয়ে গেলেন গদ্যে ও পদ্যে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেণীচেতনা অতিশয় প্রখর ও দুর্বার, সুকান্তেরও তা-ই, সুকান্তের বেলায় অতিরিক্ত একটা আয়তন সংযোজিত হয়েছিল তাঁর অনমনীয়, আপসহীন ফ্যাসিবাদ বিরোধিতায়। নজরুল-মানিক-সুকান্ত এই তিন শিল্পী মিলে তাঁদের ত্রয়ী সাধনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে মধ্যবিত্ত সংস্কারচ্যুত করে গণমানুষের খাতে চালিত করতে সমর্থ হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের আর বুর্জোয়া জীবনদর্শনের মূল্যবোধে প্রত্যাবর্তন করা কখনও সম্ভব নয়। কালের নিয়মেই সেটা অসম্ভব।

এইখানে এসে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, নজরুল-মানিক-সুকান্তের অনুসৃত সমাজদর্শন সেও তো গোটা সমাজের দর্শন নয়, বরং সমাজের এক বড় অংশের জীবনদর্শন বললেই তার সঠিক পরিচয় দেওয়া হয়। অর্থাৎ, সামন্তবাদী কিংবা বুর্জোয়া দর্শনের মত এও তো একটা খণ্ডিত দর্শন, অসম্পূর্ণ দর্শন, বিশেষ একটা শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিত্বের অধিকারে ওই দর্শনকে কি সমগ্র সমাজের অখণ্ড দর্শনের সঙ্গে সমীকৃত করা উচিত ?

এর উত্তরে বলবো, এই দর্শন গোটা সমাজের প্রতিনিধিত্ব না করলেও সমাজের অন্ততঃ শতকরা আশি-পঁচাশি ভাগ লোকের প্রতিনিধিত্ব করছে একথা অসংকোচে বলা যায়। সমাজের একদিকে আছে মুষ্টিমেয় সংখ্যক সুবিধাভোগী কায়েমী স্বার্থবাদী মানুষের ছাড়াছাড়া জটলা, আর অন্যদিকে আছে কোটি কোটি নিরন্ন-অভুক্ত-অর্ধভুক্ত শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ সঙ্ঘশক্তি। পূর্বোক্ত শিল্পীত্রয় এই শেষের বিপুল-বিশাল জনসমবায়ের সঙ্গেই তাঁদের ভাগ্য গ্রথিত করেছেন যুগের প্রভাবেও বটে তাঁদের অন্তরের টানেও বটে। তাঁদের দিকেই সংখ্যার

প্রবল গরিষ্ঠতা, অপ্রতিপাদ্য গরিষ্ঠতা। সমাজের আশি-পঁচাশি ভাগ মানুষ বেড়ার যেদিকে আছে, সেইদিকেই সমর্থন প্রসারিত করা উচিত, নাকি বেড়ার ওপাশে অবস্থানকারী স্থিতাবস্থার পরিপোষক মুষ্টিমেয় সংখ্যকের অনুকূলে যাওয়া ভাল? আশি-পঁচাশি ভাগ মানুষ সমাজের সঙ্গে পূর্ণ-সমীকৃত নয় ঠিকই কিন্তু বহুলাংশে সমীকৃত, তাতে সন্দেহ কোথায়? সমাজের অগ্রগতির বর্তমান স্তরে এই সমীকরণই সবচেয়ে আদর্শ ও সবচেয়ে বাঞ্ছিত সমীকরণ বলে গণ্য হওয়া উচিত।

□ মানিক সাহিত্যের শিল্পমূল্য □

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বাস্তববাদী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীর শিল্পমূল্য নিরূপণ করতে হলে তার বাস্তববাদের মধ্যেই তার মূল অনুসন্ধান করতে হবে। কেননা বাস্তববাদেই মানিক সাহিত্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য নিহিত আর এই বাস্তববাদই মানিকের রচিত গল্প-উপন্যাসকে আর অন্য সব কথাকারদের গল্প-উপন্যাস থেকে আলাদা করে দিয়েছে—কি চারিত্রধর্মে কি দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে। বাস্তববাদ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার শ্রেষ্ঠ পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্নও বটে আভরণও বটে।

অবশ্য বাস্তববাদ বাংলা কথাসাহিত্যে আগেও ছিল, মানিক এই তন্ত্রের পথিকৃৎ নিশ্চয়ই নন। তবে তাঁর হাতেই বাস্তববাদের সবচেয়ে পরিস্ফুরণ ও সম্প্রসার ঘটেছিল ; শুধু তাই নয়, তাঁর হাতে পড়ে বাস্তববাদের গোত্রবদলও ঘটেছিল। যা ছিল আগে নেহাৎই পর্যবেক্ষণমূলক বাস্তববাদ, তা মানিকের ক্ষুরধার লেখনীর শানে নিশিত হয়ে পরিণত হয় উদ্দেশ্যমূলক বাস্তববাদে—সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে মানিক তাঁর বাস্তববাদকে ব্যবহার করেন। মানিকের প্রচারিত বাস্তববাদে অর্থনৈতিক বৈষম্য আর শোষণবঞ্চনাপীড়িত বাঙালির সমাজের ক্ষয়ের দিকটি প্রদর্শিত হয়। বিশেষ, মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয়ের পচা-গলা রূপটি এমন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে আর কোন শিল্পী জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারেননি। কিন্তু এ সবই তিনি করেছেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। সে উদ্দেশ্য হল, এই ঘুণে-ধরা জরাজীর্ণ সমাজ কাঠামোটাকে ভেঙে ফেলে তার জায়গায় সম-সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান সাহিত্যের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া অর্থাৎ, মানিকের লক্ষ্য নিছক সাহিত্য সৃষ্টি নয়, সাহিত্য সৃষ্টিকে নতুন সমাজসৃষ্টির কাজে লাগানো।

এইখানেই পূর্ববর্তী বাস্তববাদী কথাকারদের থেকে মানিক

সাহিত্যের বাস্তবতার তফাত। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র একজন বাস্তবঘনিষ্ঠ লেখক ছিলেন, সকলেই জানেন। বস্তুত তাঁর গল্পোপন্যাসের গোটা ইমারতটি দাঁড়িয়ে আছে বাস্তবতার ভিত্তির উপর। দেখা বস্তু কিংবা দেখা মানুষকেই তিনি তাঁর ছোটগল্প আর উপন্যাসের চিত্র-চরিত্র রূপে দাঁড় করাতে ভালবাসতেন প্রধানত—ঘটনার বর্ণনায় অথবা চরিত্রের রূপায়ণে কাল্পনিকতাকে তিনি খুব বেশী প্রশ্রয় দিতেন না। শরৎ-সাহিত্যের জীবন্ততার মূলে রয়েছে তাঁর এই বাস্তবের প্রতি গভীর বিশ্বস্ততার মনোভাব।

কিন্তু ওই বিশ্বস্ততার সীমাবদ্ধতাও ছিল। তিনি একান্তভাবে পর্যবেক্ষণ বা অবজার্ভেশনকেই আশ্রয় করেছিলেন তাঁর কথাশিল্পের উপকরণ-উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে। পর্যবেক্ষণকে ছাপিয়ে তাঁর শিল্পদৃষ্টি ভবিষ্যতে প্রসারিত হয়েছে খুব কম ক্ষেত্রেই। শরৎচন্দ্র সমস্যা উত্থাপন করতেন কিন্তু সমাধানের কোন ইঙ্গিত দিতেন না। তিনি মনে করতেন সমাধানের পথের হদিস দেওয়াটা কথাশিল্পীর কাজ নয়, সমস্যাকে তুলে ধরতে পারাতেই শিল্পের সার্থকতা। সমস্যার উত্থাপনের সাহায্যে সমাজ মনকে জাগ্রত করার বেশী শরৎচন্দ্র আর কিছু চাইতেন না—তাঁর ভূমিকা ওইখানেই শেষ ভেবে তিনি তৃপ্তি মানতেন।

কিন্তু মানিকের সাহিত্য তেমন নয়। তিনি তাঁর গল্পে উপন্যাসে সমস্যার অবতারণা করতেন আবার সঙ্গে সঙ্গে সমাধানের পথও বাতলে দিতেন। এই রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঝরঝরে হয়ে আসা সমাজ কাঠামোটাকে টিকিয়ে রাখা নিরর্থক একথা যেমন তিনি বলতেন তেমনি কোন্ পথে কী উপায়ে এর অবসান ঘটিয়ে সুস্থ সমাজের প্রতিষ্ঠা করা যায় তার নিশানাও বাতলে দিতে ভুলতেন না। এই নিশানা দাগিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মানিকের অন্তরে একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্যের প্রণোদনা ছিল। সেই লক্ষ্য আর কিছু নয়, ভারতভূমিতে সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠা, আমাদের জীবনের আচরণে ও কর্মে সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণাকে জয়যুক্ত করে তোলা। এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানিকের চিন্তায় কোন অস্বচ্ছতা ছিল

না, ফলে সমস্যার চিত্রণের মত সমস্যার সমাধান নির্দেশেও তাঁকে কখনও দ্বিধাগ্রস্ত হতে দেখা যায়নি। তাঁর সমাধানগুলি ছিল অকম্পিত, প্রত্যয়সিদ্ধ, অমোঘ।

শরৎচন্দ্রের রেখাচিহ্ন অনুসরণ করে আরও কতিপয় কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে আমাদের সাহিত্যে বাস্তববাদের অনুশীলন করে গেছেন—জগদীশ গুপ্ত, নরেশ সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ। জগদীশ গুপ্ত ছিলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন বাস্তববাদী কথাকার। রোমান্টিকতার কুয়াশা বর্জিত তাঁর লেখা, চাঁছাছোলা তাঁর শিল্পের বক্তব্য। কিন্তু তাঁর বাস্তববাদের কোন লক্ষ্য ছিল না। সমাজের বর্তমান বিকৃত বীভৎস কুৎসিত রূপটিকে কেন তিনি কথাসাহিত্যের আধারে বাঙালি পাঠকের কাছে তুলে ধরছেন সে বিষয়ে তাঁর নিজের মনেই বোধ হয় স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। কেন তিনি অ-রোমান্টিক তারও কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না তাঁর লেখা থেকে। তার উপরে অতিরিক্ত যৌনতা, অকারণ যৌনতা তাঁর রচনাকে কটুস্বাদ করে দিয়েছে প্রায়শ। বাস্তবতার সঠিক আন্দাজ দেবার জন্য যৌনতাকে নিয়ে কচলানোর কোনই প্রয়োজন ছিল না। কারণ আমরা জানি যৌনতার অনুষঙ্গ বাদ দিয়েই আমাদের প্রচলিত সমাজের রূপ কত নিষ্ঠুর, কত কদাকার। বাস্তবতার অজুহাতে যৌনতাকে কেন্দ্র করে দেহ-চিত্রণের আতিশয্য বর্ণন লেখকেরই যৌন-মনস্কতার প্রক্ষেপণ মাত্র, বাস্তবতার সেটা মৌল লক্ষণ নয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতেও দেহ-চিত্রণ আছে। যেমন 'দিবারাত্রির কাব্য', 'অহিংসা', 'দর্পণ', 'চতুষ্কোণ' প্রভৃতি উপন্যাসের উল্লেখ করা যায় এ কথার নজির স্বরূপে। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত কিংবা তদনুরূপ অন্যান্য লেখকদের থেকে মানিকের দেহ-চিত্রণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থনৈতিক অসাম্য ও বৈষম্যপীড়িত বর্তমান সমাজে নরনারীর সম্পর্ক কী সাংঘাতিক অস্বাভাবিকতার ব্যাধিতে ভুগছে এবং দাম্পত্য

সম্পর্ক প্রায়শ কত কৃত্রিম ও ক্লিন্ন এইটি দেখানোই মানিকের অভিপ্রায়। আর এই অভিপ্রায়ের ভিতর লুকোছাপা কিছু নেই।—বর্তমান সমাজকে গুঁড়িয়ে ফেলে তার অস্থিচূর্ণের উপর নতুন সমাজের ভিত প্রতিষ্ঠাই ছিল সাম্যবাদী মানিকের কামনা। দেহবাদের জন্যই দেহবাদকে চিত্রিত করা মানিকের উদ্দেশ্য ছিল না।

ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত আমাদের কথাসাহিত্যে বাস্তবতার অন্যতম পথপ্রদর্শক। তবে তাঁর বাস্তবতার চিত্রণ বড়ই স্থূল, মোটা দাগের রেখায় চিহ্নিত। তাঁর 'পাপের ছাপ', 'শুভা', 'পিতাপুত্র', 'বিপর্যয়' প্রভৃতি উপন্যাসে শিল্পরসের দ্যোতনা বড় কম। কাটখোট্টা তাঁর লেখার ধরন। এই কারণেই সম্ভবত যথেষ্ট পাণ্ডিত্য আর প্রত্যয়ের দৃঢ়তা থাকা সত্ত্বেও নরেশচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যে বাস্তবতার ঘরানায় তাঁর কোন ধারা সৃষ্টি করে যেতে পারেননি, তাঁর দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের প্রভাবও খর্ব হয়ে এসেছে। তবে তাঁর শতবার্ষিকীর বৎসরে তাঁর সম্পর্কে আবার বেশ কিছুটা আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়।

শৈলজানন্দ একান্তভাবেই শরৎচন্দ্রের পথানুসারী কথাসাহিত্যিক। পর্যবেক্ষণের সুফলের উপর ভর করে তিনি তাঁর বাস্তববাদের প্রাকার দাঁড় করিয়েছিলেন। হৃদয়টি ছিল তাঁর শরৎচন্দ্রের মতই অপরিমিত মানবপ্রেমে ভরপুর। তবে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে শৈলজানন্দের বাস্তববাদের এখানে পার্থক্য যে, বিষয়বস্তুর রূপায়ণে শৈলজানন্দ বাংলার পরিচিত গ্রাম-ঘরকে অঙ্কিত করবার বদলে বাংলা-বিহারের সীমান্তে অবস্থিত কয়লা খনি অঞ্চলের কুলিকামিন নরনারীদের সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনাকেই সমধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন বাস্তববাদের উপকরণ-উপাদান রূপে। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গিটি মনোরম। তবে রচনার পিছনে কোন মহৎ উদ্দেশ্যের পোষকতা নেই, নেহাৎ গল্প বলার আকূতি থেকেই গল্প-শিল্পের চর্চা। মহৎ উদ্দেশ্যের পোষকতা বলতে আদর্শবাদের প্রণোদনা বোঝাচ্ছে। এই আদর্শবাদ শৈলজানন্দ-সাহিত্যে অনুপস্থিত। যেখানে সাধারণ আদর্শবাদেরই দেখা নেই, সেখানে মানিকের

ধরনে সাম্যবাদী আদর্শবাদ তো আরও বহু দূরস্থান, সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'পাঁক', 'পঞ্চশর', 'বেনামী বন্দর' প্রভৃতি গল্পোপন্যাস-গ্রন্থগুলিতে এক ধরনের বাস্তববাদের চর্চা করেছেন এবং সে বাস্তববাদের ভিতর কল্লোল যুগের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রত্যাশিতভাবেই নিচু তলার জীবনের ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে দেখতে পাই। শৈলজানন্দের মত প্রেমেন্দ্রও দরদী কথাকার। তবে শৈলজানন্দের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এখানে যে, প্রেমেন্দ্র বাস্তববাদী হয়েও রোমান্টিক স্বপ্নিলতার কুহক থেকে মুক্ত নন। জীবন সম্বন্ধে তাঁর মধ্যে একটা রহস্যের বোধ আছে, সেই রহস্যময়তাই প্রেমেন্দ্রের শিল্পদৃষ্টিতে রোমান্টিকতার সঞ্চার করেছে বলে সন্দেহ হয়। খুব সম্ভব মূলত কবি বলেই প্রেমেন্দ্রের মানসগঠনের এই ধাঁচ। আর এইটেই বোধকরি অন্যতম কারণ যার জন্য দেখা যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র পরবর্তীকালে তাঁর প্রথম বয়সের বাস্তববাদ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। এখন আর নিচুতলার জীবন তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে না পূর্বের মত—'এস্টাব্লিশমেণ্ট' অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানিক স্বার্থচালিত সংস্থাগুলির অনুগত লেখকদের অনুকরণে তিনিও তাঁর প্রথম বয়সের 'কমিটমেণ্ট' ভুলে গিয়ে মধ্যবিত্তের চিরাভ্যস্ত 'ভদ্রলোগী' সংস্কার-গুলির উপর দাগা বুলিয়ে চলেছেন অন্ধভাবে পরম নিষ্ঠায়। তিনি এখন আমাদের বনেদী পাঠকসমাজ কর্তৃক 'গৃহীত' একজন 'সম্ভ্রান্ত' লেখক—তাঁর পুরোনো বিদ্রোহের ছিটেফোঁটাও আজ আর বেঁচে নেই।

অথচ আমরা জানি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবর এই মধ্যবিত্ত জীবনরীতিসুলভ ভদ্রলোকী সংস্কারগুলির উপর চাবুক হেনে গেছেন নির্মমভাবে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মেকী ভদ্রতার তিনি ছিলেন দুশমন স্বরূপ। ভদ্রলোকদের 'ভদ্রলোগামি'র অন্তরালে যে-পর্বতপ্রমাণ ভণ্ডামি আর মিথ্যাচার লুকিয়ে আছে তার মুখোশটি তিনি খসিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর একাধিক ছোটগল্পে ও উপন্যাসে। 'সমুদ্রের স্বাদ' বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'লেখকের কথা' শিরোনামে

লেখেন—"ভাবের আবেগে গলে যেতে ব্যাকুল মধ্যবিত্তদের নিয়ে 'সমুদ্রের স্বাদের' গল্পগুলি লেখা। প্রথম বয়সে লেখা আরম্ভ করি দুটি স্পষ্ট তাগিদে, একদিকে চেনা চাষী মাঝি কুলি মজুরদের কাহিনী রচনা করার, অন্যদিকে নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে মূর্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে সচেতন করার। মিথ্যার শূন্যকে মনোরম করে উপভোগ করার নেশায় মরমর এই সমাজের কাতরানি গভীরভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল। ভেবেছিলাম, ক্ষতে ভরা নিজের মুখখানাকে অতি সুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা যদি নিষ্ঠুরের মত মুখের সামনে আয়না ধরে ভেঙ্গে দিতে পারি, সমাজ চমকে উঠে মলমের ব্যবস্থা করবে। তখন জানা ছিল না যে ওগুলি জীবন যুদ্ধের ক্ষত নয়, জরার চিহ্ন, ভাঙনের ইঙ্গিত ; জানা ছিল না যে স্বাভাবিক নিয়মেই এ সমাজের মরণ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী এবং তাতেই মঙ্গল—সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ভেঙে বিরাট জীবন্ত সমাজে আত্মবিলোপ ঘটার মধ্যেই আগামী দিনের অফুরন্ত সম্ভাবনা।"

এই একই ভূমিকায় মানিক একটু পরে লিখছেন—"মধ্যবিত্ত ভদ্রদের পরিণাম জানতাম না বটে ; তবে পচা ভদ্রতার মিথ্যা খোলস খুলে সবাই ছোটলোক হোক এ পরিণাম যে কামনা করতাম আমার অনেক গল্পেই তা ঘোষণা করার চেষ্টা করেছি।"

এর থেকেই মধ্যবিত্ত সমাজের পরিণাম সম্বন্ধে মানিকের নির্মোহ দৃষ্টির পরিচয় মেলে। মধ্যবিত্ত মানসিকতার চূড়ান্ত অসারতাও তাঁর চোখে স্পষ্ট। অথচ আমাদের বেশ কিছু সংখ্যক লেখক আজও মোহভরে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে সচেষ্ট। প্রথম বয়সে বিদ্রোহ-প্রতিবাদ ইত্যাদি নিয়ম-ভাঙার পথে সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত করে পরে 'তোবা তোবা' করে রণে ভঙ্গ দিয়ে 'ভালো মানুষ' লেখক বনে যাবার দৃষ্টান্ত শুধু প্রেমেন্দ্র মিত্রই নন, আরও অনেকে আছেন। অচিন্ত্যকুমারও এই দলে পড়েন।

অচিন্ত্যকুমার প্রথম দিকে 'বেদে' এবং মধ্য বয়সে 'যতন বিবি',

'কাঠ-খড়-কেরাসিন' প্রভৃতি উপন্যাস-গল্পের বই লিখে বাস্তবতার হদ্দ করে ছেড়েছিলেন। শেষোক্ত গল্প সংগ্রহের বই দুটিতে বাস্তবতার ঠাটের বদলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে-সংঘাতে জর্জরিত বাংলার গাঁয়ের নিরন্ন বুভুক্ষু কৃষক নর-নারীর দৈন্য দশার অতি মর্মস্পর্শী চিত্র আছে। যুদ্ধের বাজারের নিত্য অভাবের পীড়নে দিশেহারা ভাগ্যহত চাষী সমাজের যে ছবি তিনি এখানে এঁকেছেন তা চিত্তকে দ্রবীভূত করে। অথচ সেই অচিন্ত্যকুমারই কিনা পরে বাস্তববাদকে জলাঞ্জলি দিয়ে ভক্তিবাদে আত্মসমর্পণ করেছেন দেখা যায়। মঠ-মিশনের সঙ্গে কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষি করবার আকুলতায় তিনি বাস্তববাদকে শিকেয় তুলে রাখতেও পশ্চাৎপদ হননি। সে-বাস্তববাদ আর মাটিতে কখনও নামেনি। ভক্তির ঠাণ্ডা হিম স্পর্শে বাস্তববাদ কর্পূর হয়ে উবে যেতে আমরা দেখলুম।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এঁদের পরিপোষিত বাস্তববাদ থেকে মানিকের বাস্তববাদের ধরন একেবারেই আলাদা। এঁদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুর লেখক ছিলেন মানিক। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাকে সাহিত্যেও সমপরিমাণে আচরণ করতে চেষ্টিত থাকতেন। তাঁর প্রত্যয় আর তাঁর সাহিত্য এক বিন্দুতে এসে মিলে গিয়েছিল। অপরাপর একাধিক লেখকের মত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে বিচরণ করেননি—জায়গা নাড়িয়ে এক ঠাঁই থেকে অন্য ঠাঁই যাওয়া তাঁর স্বভাব ছিল না। ধ্রুব নক্ষত্রের মত একটি বিশ্বাসেই তিনি নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলেন, সেই বিশ্বাসকেই তাঁর সাহিত্যের সঞ্চালক করে পথ চলেছেন। আর এই বিশ্বাসেই তাঁর জীবনপাত হয়েছিল।

মানিক সাহিত্যে যে বাস্তববাদ প্রতিফলিত হয়েছিল, স্বরূপ লক্ষণ অনুযায়ী তার নামকরণ করতে গেলে তাকে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ' নামে অভিহিত করতে হয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের পরিভাষায় যাকে 'সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম' বলা হয়, এটি তার সঙ্গে অভিন্ন বা তারই স্বগোত্র। এই বাস্তববাদ নিছকই পর্যবেক্ষণনির্ভর বাস্তববাদ নয়, পরন্তু

উদ্দেশ্যভিত্তিক বাস্তববাদ। সমাজ-চেতনা এর কুললক্ষণ, সমাজ-পরিবর্তন এর লক্ষ্য। সমাজ-পরিবর্তনও আবার একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে সমাজ-পরিবর্তন—সাহিত্যের আধারে সমাজতন্ত্রের আবাহন, সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা। রুশ সাহিত্যে গর্কি এই জাতীয় সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম-এর চর্চা করতেন, আমাদের সাহিত্যে তারই উত্তরসাধক হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিক-সাহিত্যের শিল্পমূল্য এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের বিচার করতে হবে।

মানিকের সাহিত্যে বাস্তবতা এবং শিল্পোৎকর্ষ দুইয়েরই এককালীন সমাহার ঘটেছিল। শুধু বাস্তবতা নয়, শুধুই শিল্পরস নয়, দুইয়ের যোগফল মানিক-সাহিত্যের রূপ ধরেছিল। অবশ্য প্রথম দিক্‌কার রচনায় মানিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রভাব সঞ্জাত মনো-বিকলনের কিছু আতিশয্য ঘটেছিল। মানুষের অসুস্থ বাসনা-কামনাকে চিড়ে-ফেঁড়ে ব্যবচ্ছেদ করে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করবার একটা প্রবণতা একটা আবেশের (অবসেসন) মত তাঁকে পেয়ে বসেছিল। মানুষের আচরণের 'কী' ও 'কেন' তাঁকে উদ্ব্যস্ত করে রাখত এবং যতক্ষণ না তার সন্তোষজনক সমাধান তিনি নিজের মধ্যে খুঁজে পেতেন ততক্ষণ তাঁর চিত্ত শান্তি মানত না। এই অস্থিরতা এসেছিল তাঁর মধ্যে দুর্মর বৈজ্ঞানিক কৌতূহল থেকে, প্রতিটি মানবীয় আচরণের তল পর্যন্ত খুঁজে দেখবার বাই—হাঁ, একে 'বাই'-ই বলতে হয়—তাঁর মনকে সর্বদা অশান্ত করে রাখত। ফলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্জ্ঞান মনের সূক্ষ্ম ছলাকলা-বিভ্রমের স্বরূপ নির্ণয়ে তাঁকে বিশেষভাবে মনোযোগী হতে দেখি প্রথম দিকের গল্পোপন্যাসে। তখনও তাঁর মধ্যে সামাজিক দৃষ্টির তেমন করে উদ্ভাস ঘটেনি। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণপ্রবণতা যে মানিক-সাহিত্যের যথেষ্ট ক্ষতি করেছিল গোড়ার দিকে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

এ কথার প্রমাণ স্বরূপে প্রথম দিকের উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য',

'পুতুলনাচের ইতিকথা' কিংবা 'মিহি ও মোটা কাহিনী'র মনস্তত্ত্বপ্রধান গল্পগুলির উল্লেখ করতে হয়। 'বৌ' পর্যায়ের গল্পগুলিকেও এই পর্যায়ের রচনার অন্তর্ভুক্ত করা চলে। অতিশয় অন্তর্নিবেশমূলক এ সকল রচনার প্রকৃতি—ব্যক্তিসাক্ষিক (সাবজেকটিভ), আত্মকেন্দ্রিক। বৃহত্তর সমাজ এ সকল রচনায় কম বেশী অনুপস্থিত। ফ্রয়েড মানুষের কামনা-বাসনার উৎস সন্ধানে পরিপার্শ্বের ভূমিকা তেমন মানতেন না, বংশগতি (হেরিডিটি) ও বাল্যার্জিত সংস্কারকেই সমধিক প্রাধান্য দিতেন। এখানেও অনেকটা সেই রকমের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করা হয়েছে।

যেমন 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসে রোমান্টিক প্রেমের অসারতা দেখানোই উদ্দেশ্য। প্রেম নামক সমাজপ্রচলিত অভ্যাসটিকে ঘিরে যে মধুর স্বপ্নমোহ জড়ানো থাকে তার' পর্দা ছিন্নভিন্ন করে দেখানোর জন্যই মানিক এই উপন্যাসে হেরম্ব নামক এক জটিল মনের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। হেরম্ব, মালতী আর কিশোরী মেয়ে আনন্দ এই দুয়েতেই একই কালে আসক্ত, ইদানীং আনন্দের প্রতিই তার মনোযোগ কিঞ্চিৎ বেশী। মালতী পরস্ত্রী জেনেও তার প্রতি তার আকর্ষণের কমতি হয় না। এ এক অসুস্থ, অস্বাভাবিক, বিকৃত প্রেমের বিগ্রহমূলে ভোগারতির চিত্রণ। মানিক নির্মোহ দৃষ্টির নির্বেদ সহকারে এমন যে জটিল-কুটিল দেহবাসনার অন্ধকার, তার গহনে তাঁর শিল্পদৃষ্টিকে সঞ্চালিত করেছেন। এমনতর অন্ধকারের উপর বৈজ্ঞানিক সন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে তাঁর হাত একটুও কাঁপেনি। ভালবাসা নামক বস্তুটি যে সবটাই জৈব প্রবৃত্তির একটা খেলা, তার ভিতর রোমান্সের বাষ্পও নেই—এইটে প্রতিপাদন করাই 'দিবারাত্রির কাব্য' নামক উপন্যাসটির উদ্দেশ্য বলে মনে হয়।

শিল্পকর্ম হিসাবে খুবই শক্তিশালী রচনা, কিন্তু সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে অল্পবিস্তর অসার্থক। ব্যক্তিমনের অসুস্থ কামনা-বাসনাই এই উপন্যাসের কেন্দ্র অধিকার করে রয়েছে, বৃহত্তর সমাজ এখানে অনুপস্থিত। এই রচনায় ব্যক্তিমনের অন্তর্লীন কুটিল-ক্লিন্ন চিন্তার

আঁকিবুঁকি অতি স্পষ্ট, সুস্থ মননের আলো অন্ধকার গহনের উপর তেমন পড়েছে কিনা সন্দেহ।

অন্যপক্ষে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' খুবই অসামান্য উপন্যাস শিল্পের মানদণ্ডে কিন্তু অকারণ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা-কুটিলতায় কিয়ৎ পরিমাণে খণ্ডিত ও ব্যক্তিবাদের দ্বারা কলুষিত। তাছাড়া বইটিতে যে বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে—নিয়তিবাদ (মানুষ দৈবের হাতের ক্রীড়নক মাত্র, তার স্বাধীন ইচ্ছার মূল্য সামান্য : শশীর গাঁওদিয়া গ্রাম ছেড়ে বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা আকাশকুসুম স্বপ্ন মাত্র, ভবিতব্যের বিধানেই এঁদো গাঁয়ের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর নেই ইত্যাকার সব ভাবনা)—স্পষ্টতই মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির আদর্শ এবং সেই আদর্শের জোরে সকলে মিলে একসঙ্গে অপ্রতিহত বেগে পথ চলার নীতির পরিপন্থী। সনাতন ভারতীয় অদৃষ্টবাদ এখানে লেখকের অজ্ঞাতসারেই খুব সম্ভবতঃ বইটির উপর অনভিপ্রেত ছাপ ফেলেছে এবং তার শিল্পমূল্য কমবেশী কাঁচিয়ে দিয়েছে।

'মিহি ও মোটা কাহিনী'র গল্পগুলির অতিরিক্ত মনস্তত্ত্ব পরায়ণতা ও বিকৃত কৌতূহল ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান তত্ত্বের অস্বাভাবিকতারই শুধু প্রমাণ করে, আর কিছু করে না। টিকটিকি, ছায়া, বিপত্নীক প্রভৃতি ছোটগল্প অসুস্থ মনস্তত্ত্ববিলাসের এক একটি মোক্ষম নমুনা। কিংবা 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পসংগ্রহের মানুষ হাসে কেন গল্পটি মর্বিড চিন্তার সঙ্গে ব্যাধির সাদৃশ্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়। 'বৌ' পর্যায়ের গল্পগুলিও তথৈবচ।

কিন্তু মানিকের এই মনস্তাত্ত্বিক আবেশ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। যখন থেকে তাঁর চেতনায় সমষ্টিচেতনার উত্তরোত্তর উন্মেষ ঘটতে লাগল, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দীক্ষায় জনকল্যাণের আদর্শে তাঁর মন দৃঢ়মূল-ভাবে প্রোথিত হতে থাকল তখন থেকেই তাঁর সাহিত্য থেকে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের ব্যক্তিবাদী স্বেচ্ছাচারী চিন্তার প্রভাব ঝরে যেতে আরম্ভ করল। ফ্রয়েডের স্থান দখল করলেন মার্কস, ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্ম-আবেশী চিন্তার বদলে তার জায়গায় দেখা দিল সমূহ মানুষের মঙ্গলামঙ্গলের

ধারণা। ব্যক্তির মনোবিকারের অন্তহীন ব্যবচ্ছেদী বিশ্লেষণে আর তিনি সুখ পেলেন না, এখন থেকে তাঁর দৃষ্টি ক্রমশ হয়ে উঠল বহির্মুখ। অন্ধকার থেকে তাঁর মনোযোগ আলোর মধ্যে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাইল। আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থভাবনা নয়, সমষ্টিগত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যেই যে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত—এই বোধে তিনি উত্তরোত্তর দীপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর সাহিত্যেরও গোত্রবদল হল।

এই গোত্রবদলের প্রক্রিয়ার আরম্ভ 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস দিয়ে এবং শেষ হয়েছে একেবারে অন্তিম পর্যায়ে এসে। প্রায় দুই দশকের অবিচ্ছেদ এই প্রক্রিয়া। মধ্যবর্তী স্তবে এই বিরতিছেদহীন পর্বের কয়েকটি লক্ষণীয় দিক্‌চিহ্ন হল—'সহরতলী' উপন্যাস দুই খণ্ড, 'দর্পণ', 'জীয়ন্ত', 'স্বাধীনতার স্বাদ', 'সোনার চেয়ে দামী' দুই খণ্ড, 'সার্বজনীন', 'শুভাশুভ', 'হরফ' প্রভৃতি উপন্যাস এবং উত্তরকালের একাধিক ছোটগল্প যার মধ্যে পড়ে ফেরিওয়ালা, দুঃশাসনিক, কংক্রীট, শিল্পী, মাসি-পিসি, বাগ্দীপাড়া দিয়ে, পেটব্যথা, হারানের নাতজামাই, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, ওরা ছিনিয়ে খায় না কেন, টিচার প্রভৃতি অবিস্মরণীয় সব রচনা। প্রথম বয়সের প্রাগৈতিহাসিক, টিকটিকি, সরীসৃপ, কুষ্ঠরোগীর বউ প্রভৃতি গল্প থেকে এ সকল গল্পের প্রকৃতি, দৃষ্টিকোণ ও বক্তব্য এতই আলাদা যে প্রথম দর্শনে একই লেখকের লেখা কিনা এমন বিভ্রম জাগে। উত্তর-কালের গল্পগুলির বর্ণন ঋজু, সরলরেখ, বলিষ্ঠ। প্রথম বয়সের গল্পের মত যৌনতা কিংবা মনোবিকারের রেখাঙ্কনে বক্রকুটিল নয়। সমাজকল্যাণা-দর্শের বহির্মুখী রৌদ্রালোকের ছটায় এখানে সবই স্বচ্ছ, স্পষ্ট, পরিষ্কার; অন্ধকার ছায়ার কুটিলতায় মলিন কিংবা বাঁকাচোরা নয়। শিল্পের দৃষ্টি ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে সমাজদর্শনে উত্তরিত হলে তার এম্নিতর রূপান্তরই বুঝি হয়।

মানিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তবেই তার যথার্থ শিল্পমূল্য আমরা উপলব্ধি করতে পারব।

□ বাংলা সাহিত্য ও মধ্যবিত্ত মানসিকতা □

যে সব লেখক বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেন—তা সে সাহিত্যের সৃষ্টিশীল ধারাতেই হোক আর জ্ঞানবাদী ধারাতেই হোক—মূলতঃ নিয়ম-মানা প্রথাবদ্ধ শৃঙ্খলার আনুগত্যকারী যে-মধ্যবিত্ত মানসিকতা ও জীবনরীতি, তারই অনুসরণ করে থাকেন; তাঁদের ভিতর বিদ্রোহের মনোভঙ্গী কদাচিৎ দেখা যায়। বিদ্রোহের জন্য জীবনে মূল্য দেবার অর্থাৎ ত্যাগ স্বীকারের ও লাঞ্ছনা বরণের সংস্কার তো আরও কম। ইংরেজ অভ্যাগমের পরবর্তী আমাদের বাংলা সাহিত্য বড্ড বেশী ছা-পোষা, সংসার-আসক্ত, গতানুগতিক জীবনযাত্রা ও সমাজ-অনুমোদিত পথ ধরে চলতে অভ্যস্ত, শান্তশিষ্ট ও নিরীহ। বাঙালী মধ্যবিত্ত নির্বিরোধ জীবনরীতির ছক অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যের দেহ গঠিত এবং তার ভাব-মানসের ভিতর কি শহুরে কি গ্রামীণ বাঙালী মধ্যবিত্ত অভ্যাস ও বিশ্বাসের ছাপ আষ্টে-পৃষ্ঠে অনুলিপ্ত। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সমালোচনা, নিয়ম-রাহিত্য, বিদ্রোহ ও বিপ্লব—এ সব মূল্যবোধ বা তজ্জাত জীবনাচরণের আদর্শ আমাদের লেখকদের লেখায় বড় একটা কল্কে পায় না; কিছুসংখ্যক গণনীয় ও উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে সকলেই প্রায় পোষ-মানা তথাকথিত ভালমানুষী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-কথিত "ভদ্রলোগী", জীবনাভ্যাসের হাতে-ধরা হয়ে চলতে ভালবাসেন। গতানুগতিক নিয়মের বাইরে একটি স্বতন্ত্র কিংবা প্রতিবাদী জীবনের পথে চলতে গেলেই আমাদের সাহিত্যের গড়পড়তা বেশীর ভাগ লেখকেরই অস্বস্তি হয়, হাঁফ ধরে যায়, তাঁরা হাঁসফাঁস করতে থাকেন। মূলতঃ মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ শাসিত বাঙালীর সাহিত্য-সংসারে অ-গতানুগতিক অভ্যাস বিশ্বাসের অনুমোদন নেই বললেই চলে, যদি-বা কোথাও কোনও সময়ে শাসন-বারণ-না-মানা নিয়মবিমুখতার ঝোঁক দেখা দেয়, তা স্বভাবস্থ হয় না;

প্রায়শঃ অস্বাভাবিক দাপাদাপিতে পর্যবসিত হয়, কপালে অনভ্যাসের ফোঁটা চড়চড় করার মত তা কেবলি বিসদৃশতার পথ ধরে চলতে চায়। ফলে নিয়মভাঙার আবেগ উচ্ছৃঙ্খলতার আঘাটায় মুখ থুবড়ে পড়ে শোচনীয়ভাবে অবসিত হয়।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্বে সত্যিকারের বিপ্লবী বা বিদ্রোহী মনোভঙ্গীর লেখক খুব কমই জন্মেছেন। তাহলেও একেবারে যে জন্মাননি এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। যে কটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের অস্তিত্ব আছে বলে পূর্বের প্যারায় উল্লেখ করেছি তাঁদের মধ্যে পড়েন—মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে দু'জন কবি এবং দু'জন কথাসাহিত্যিক। এঁদের জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনের ধারা আমাদের সাহিত্যের প্রথাবদ্ধ জীবনাচরণরীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এঁদের প্রত্যেকেই বিদ্রোহের আবেগ নিয়ে জন্মেছিলেন এবং তাঁদের নিজ নিজ জীবনে এবং / অথবা সৃষ্টিতে সেই বিদ্রোহের অভীপ্সাকে রূপদান করবার চেষ্টা করে গিয়েছিলেন। যদিও সত্যের খাতিরে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এঁরা বিদ্রোহকে তাঁদের ন্যায়সংগত পরিণতির স্তর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারেননি। কারও বেলায় বিদ্রোহের শাসন-নাশন ভাবাবেগের তরণী ব্যক্তিগত জীবনের উৎকেন্দ্রিকতার চড়ায় ঠেকে ট্রাজিডির ঘূর্ণিস্রোতে বানচাল হয়ে গেছে (মাইকেল, নজরুল ও মানিক), কারও বেলায় বর্ণশ্রেণিগত রক্ষণ-শীলতার সংস্কার বিদ্রোহের আকূতিকে দাবিয়ে শেষ অবধি তাঁর প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার উপর জয়ী হয়ে উঠতে চেয়েছে (শরৎচন্দ্র)।

অর্থাৎ বিদ্রোহ দিয়ে জীবনারম্ভ করলেও এঁদের কেউই শেষরক্ষা করে যেতে পারেননি ; এদেশের প্রতিকূল পরিবেশের কারণেই হোক আর স্বীয় ব্যক্তি-চরিত্রের মধ্যেই ধ্বংসের বীজ নিহিত থাকার কারণেই হোক, এঁদের প্রত্যেকেরই বিদ্রোহের তেজ অর্ধপথে এসে ক্ষীণবল হয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে। এঁদের চারজনারই সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহ

ও বিপ্লবের পথে পূর্ণ-পরিণত হয়ে ওঠার অশেষ, অজস্র, অফুরন্ত সম্ভাবনা ছিল ; কিন্তু এই পোড়া দেশের জলবায়ুর দোষেই সম্ভবত ওই কাঙ্ক্ষিত পূর্ণ-পরিণতি বাস্তবায়িত হয়ে উঠতে পারেনি। এ বাংলা সাহিত্যের এক পরম দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, এঁরা বিদ্রোহী হয়েও তাঁদের বিদ্রোহের সুফল পুরোপুরি ঘরে তুলতে পারেননি, তাঁদের সৃষ্টিশীলতার সংগ্রামী তথা প্রতিবাদীদৃষ্টান্তকে পরাহত করে গুটি-গুটি-পা-পা-করে-চলা প্রতি-পদক্ষেপে-অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনার মনোভাবপ্রসূত হিসাবীবুদ্ধিসর্বস্ব মধ্যবিত্ত মানসিকতারই এযাবৎ জয় হয়ে চলেছে বাংলা সাহিত্যের সংসারে, আজও এই ধারার বিরাম হয়নি।

আমাদের সাহিত্যে বিদ্রোহী মনোভাবযুক্ত লেখকের সংখ্যাস্বল্পতা থাকলেও পাশ্চাত্য সাহিত্যে কিন্তু এ-জাতীয় শিল্পীর অপ্রতুলতা নেই। বস্তুতঃ, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, স্পেনীয়, স্ক্যাণ্ডিনেভীয়, রুশ সব সাহিত্যেই কি জীবনাচরণে কি শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে অগতানুগতিক কিংবা বিদ্রোহী মনোভঙ্গীর লেখকের উদাহরণ ভূরি-ভূরি। মার্কিন সাহিত্য থেকেও এরকম উদাহরণ প্রচুর দেওয়া চলে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করলেই এ কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হবে।

যথা, মিল্টন, বাইরন, শেলী, উইলিয়াম ব্লেক, গোল্ডস্মিথ, ডানিয়েল ডিফো, সুইফট, অস্কার ওয়াইল্ড, বার্নার্ড শ', ডেভিস, ডাইলান টমাস, বার্টর‍্যাণ্ড রাসেল, আওয়েন, কডওয়েল প্রমুখ (ইংরেজী ও আইরিশ সাহিত্য) ; রুশো, ভলটেয়ার, দিদেরো, ভিক্টর হুগো, স্তেঁধল, সাঁত-বুভ, রেনাঁ, জর্জ স্যাণ্ড, ফ্লবেয়র, মোপাসাঁ, জোলা, আনাতোল ফ্রান্স, বোদলেয়ার, পল ভালেরি, র‍্যাবোঁ, ভার্লেন, রোমাঁ রোলাঁ, আলবেয়ার কামু, জাঁ-পল সার্ত্র, মাদাম বোভোয়া প্রমুখ (ফরাসী সাহিত্য) ; এডগার এলেন পো, মার্ক টোয়েন, ওয়াল্ট হুইটম্যান, ও হেনরী, র‍্যালফ ফক্স, এজরা পাউণ্ড, হেমিংওয়ে প্রমুখ (মার্কিন সাহিত্য) ; সার্ভেন্টিস, জাঁসিতো বেনাভাঁতে, গ্রাৎসিয়া লরকা প্রমুখ (স্পেনীয় সাহিত্য) ; হার্ডার, গ্যেটে, শীলার, হাইনে, টমাস ম্যান, হেনরিক ম্যান, সোয়াই-

ৎসার, ষ্টীফেন ৎসাইক, বার্টোল্ট ব্রেখ্‌ট প্রমুখ (জার্মান সাহিত্য) ; হ্যানস এণ্ডারসন, ইবসেন, ন্যুট হামস্থন, জোহান বোয়ার প্রমুখ (স্ক্যাণ্ডিনেভীয় সাহিত্য) ; এবং সর্বশেষে পুশকিন, ডস্টয়েভ্‌স্কী, বেলিনস্কি, টুর্গেনিভ, টলস্টয়, শেখভ, ভ্‌লাডিমির করোলেঙ্কো, গর্কি, এসেনিন, মায়কোভ্‌স্কি, আলেকজাণ্ডার ব্লক, পাস্টারনাক, এরেনবুর্গ, সলৎজেনস্কিন প্রমুখ (রুশ সাহিত্য)।

গতানুগতিকতা ও নিয়মের পথ সযত্নে বর্জনকারী কবি, কথা-সাহিত্যিক, নাট্যকার ও অন্যবিধ শিল্পীর সে এক সারিবদ্ধ দীর্ঘবিসর্পিত মিছিল। সেই তুলনায় আমাদের সাহিত্যে এ জাতীয় দৃষ্টান্ত "কোটিতে গোটিক" বললেও চলে—পূর্বোল্লিখিত কয়েকটি নামের উদাহরণ থেকেই বোঝা যায় ওই সংখ্যা এককরাঙ্গুলিমেয়। তবু ভাল যে আমাদের সাহিত্যে এই ধরনের নিয়ম-রাহিত্যের দৃষ্টান্ত একেবারে শূন্য নয়। কম হলেও কিছু অন্ততঃ আছে। "নাই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভাল।"

এইখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। পাছে কেউ মনে করেন যে আমি নিয়মরাহিত্য বা বিদ্রোহপ্রীতির নামে কার্যতঃ উচ্ছৃঙ্খলতা কিংবা উৎকেন্দ্রিকতার পক্ষে ওকালতি করছি তাঁদের ভুল নিরসনের জন্য বলি যে, উচ্ছৃঙ্খলতা কিংবা উড়নচণ্ডী উৎকেন্দ্রিকতার পক্ষে সাফাই গাওয়া আদৌ আমার অভিপ্রায় নয়। বরং আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি সাহিত্যে বিদ্রোহী মনোভঙ্গীর পক্ষপাতী ; কিন্তু বিদ্রোহী মনোভাবকে অনুসরণ করবার অজুহাতে নিজের জীবনকে উড়িয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবার অভ্যাসের আদৌ পক্ষপাতী নই। গতানুগতিক অভ্যাস ও বিশ্বাসকে অস্বীকার করতে গিয়ে অসংযমের পথে চলা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। বিদ্রোহ আর পশ্চিমী সাহিত্য ও সমাজের তথাকথিত বোহিমিয়ানিজম এক বস্তু নয়। উচ্চণ্ড স্বভাবকে কেউ যেন প্রতিবাদী স্বভাব বলে ভুল না করেন। বিদ্রোহ একটা দৃষ্টিভঙ্গী, জীবন, জগৎ ও সমাজকে দেখবার একটা বিশেষ ধরন ; একে অসংযত জীবনাচরণের সঙ্গে সমীকৃত করে দেখবার কোনই যৌক্তিকতা নেই। কোন লেখক

বিদ্রোহী হলেই তাঁকে নেশাসক্ত, ইন্দ্রিয়াসক্ত কিংবা এই জাতীয় আর কিছু হতে হবে এটা কোন কাজের কথা নয়। চলিত বা গতানুগতিক জীবনরীতিকে অস্বীকার করবার অর্থ বেহিসাবী, বেনিয়ম উৎকেন্দ্রিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করা নয়। শেকল ভাঙার তাগিদ আর উচ্ছৃঙ্খলতা এক বস্তু নয়।

বরং শিল্পে বিদ্রোহী হতে হলে জীবনে সংযমী হওয়ার আরও বেশী দরকার। প্রতিভা আর শক্তিকে বিদ্রোহের পথে চালনা করতে গেলে ব্যক্তিগত আচার-আচরণের ক্ষেত্রে শক্তি ও প্রতিভাকে সযত্নে পরিচর্যা করার আরও বেশী প্রয়োজন হয়ে পড়ে। চিন্তায় বিপ্লবী হতে গেলে সেই চিন্তার শক্তিকে কেমন ভাবে সংরক্ষণ করতে ও তাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হয় তার সঠিক আর্ট জানা চাই। এই ক্ষেত্রে গার্হস্থ্য-পনার বিদ্যা খুবই জরুরী। নদীর এক পাড় ভাঙে, অন্য পাড় গড়ে ওঠে। নদীর দুই পাড়ই যদি একই সঙ্গে সমান তালে ভাঙতে থাকে তাহলে নদী আর নদী থাকে না, তা হয়ে ওঠে অকূল জলবিস্তার, বিস্তীর্ণ বারিরাশি। তাতে স্রোতের গতিবেগ থাকে না, তার এগিয়ে চলার দম ফুরিয়ে আসে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, বিদ্রোহ ও বিপ্লবকে শিল্পে বা সাহিত্যে ফলপ্রদভাবে কার্যকর করতে গেলে সেইজন্যই ব্যক্তিক স্তরে আরও বেশী সংযতাচারী হওয়া আবশ্যক। সেইখানে দুই পাড়কে একসঙ্গে ভাঙলে চলে না, একটি পাড়কে সযত্নে রক্ষা করতে হয়। অন্য একটি তুলনার আশ্রয় নিয়ে বলি, মোমবাতির দুটি দিকই যদি একই কালে পুড়তে থাকে তাহলে সেই মোমবাতি ফুরিয়ে আসতে কতক্ষণ! ইংরেজীতে একটি কথাই আছে, “বার্নিং ক্যাণ্ডেল অ্যাট বোথ এণ্ড্স”। সুতরাং ক্ষয়ের প্রক্রিয়া দ্বিমুখী হলে চলে না, একটি মুখকে আলগোছে বাঁচিয়ে চলতে হয়। সাহিত্যে বিদ্রোহী হতে চাইলে ব্যক্তিগত জীবনের স্তরে সংযতাচারী হওয়া আবশ্যক।

মধুসূদন

আমাদের সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন এক মহাবিদ্রোহী কবি।

অমিত-শক্তিশালী এক প্রতিভাধর স্রষ্টা। কিন্তু মধুসূদনের এই বড় ভুল হয়েছিল যে, তিনি জীবনের বাতি একই সঙ্গে দুদিকে পুড়িয়ে চলেছিলেন। সেইজন্য এত তাড়াতাড়ি তিনি নিভে গেলেন। তাঁর সাহিত্য ও কাব্যসাধনার আয়ুষ্কাল মাত্র সাত কি আট বৎসর। একেবারে গোড়ার দিক্‌কার ইংরেজী ভাষায় কাব্যরচনার পর্ব বাদ দিলে তাঁর সত্যিকারের সৃজনী অধ্যায়ের শুরু হয় ১৮৫৯ সালে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনার দ্বারা। তারপর একে একে 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০), 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০), 'পদ্মাবতী' নাটক (১৮৬০), 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' (১৮৬০), 'মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১), 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২) এবং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে মাত্র সাত বছরের আয়ুষ্কালে সীমিত তাঁর সৃষ্টিশীলতার অধ্যায়। পরে অবশ্য বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে আসবার পর তিনি আর একবার সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং ওই পর্বে 'হেক্টর বধ', 'মায়াকানন' জাতীয় দুই-একটি কাব্য ও নাট্য রচনা করেছিলেন কিন্তু সেগুলি শিল্পোৎকর্ষের বিচারে মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। তার অর্থ, চতুর্দশপদী কবিতাবলী প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সৃষ্টিজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল বলা চলে।

এই মানদণ্ডে মধুসূদনের বিদ্রোহী প্রতিভাকে যদি একটা প্রজ্বলিত উল্কার সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে কিছু অন্যায় হয় না। উল্কার আকস্মিকতা, প্রচণ্ড গতিবেগ, চোখ-ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য নিয়ে তাঁর বাংলার সাহিত্যগগনে হঠাৎ-আবির্ভাব, আবার উল্কারই মত আকস্মিকের চমক সৃষ্টি করে তাঁর সহসা নিভে যাওয়া। এ কখনই ঘটতে পারতো না যদি মধুসূদন বিদ্রোহের সঙ্গে লালন ও ধারণ করবার বিদ্যা আপনার স্বভাবের ভিতর অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু ওই বিদ্যা তাঁর অজ্ঞাত ছিল। এটা তাঁর নিজেরও দুর্ভাগ্য, বাংলাসাহিত্য আর দেশেরও দুর্ভাগ্য যে, শক্তির গার্হস্থ্যপনা অর্থাৎ সংরক্ষণ-কুশলতা কাকে বলে তা তিনি জানতেন

না। মধুসূদন অমিতব্যয়িতা আর বেহিসাবীপনার দ্বারা তাঁর গোটা জীবনটা উড়িয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের প্রদীপের সলতে একসঙ্গে তুদিকেই পুড়িয়ে চলেছিলেন। এ যদি না হতো তো বাংলা সাহিত্য ও কাব্য যে তাঁর দানে কত দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হতে পারতো তার ইয়ত্তা পাওয়া যায় না।

কতবড বিদ্রোহী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন মধুসূদন তা আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারব। তিনি পাঁচটি বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্বের প্রবর্তক। তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম বিয়োগান্ত নাট্য-রচয়িতা (কৃষ্ণকুমারী নাটক); তিনি বাংলায় প্রথম সার্থক প্রহসনের স্রষ্টা (একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ); তিনি বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের (ব্ল্যাঙ্ক ভার্স) উদ্ভাবয়িতা; বাংলা কবিতায় সনেট রচনার পাথিকৃত্যের গৌরবও তাঁর (চতুর্দশপদী কবিতা-বলী); সর্বোপরি ভারতীয় সাহিত্যসংসারে দীর্ঘকালপ্রচলিত নায়ক-নায়িকার ধারণায় বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটানোর কৃতিত্বও তাঁর (রামায়ণের রাম-লক্ষ্মণের বদলে রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ এবং সীতার বদলে প্রমীলাকে সমধিক মহত্বে ভূষিতকরণ)। এই থেকেই বোঝা যায় গতানুগতিক নিয়ম ভাঙার অভীপ্সাযুক্ত নব নব উন্মেষশালিনী অসাধারণ কারয়িত্রী প্রতিভার ধারক-বাহক হয়ে তিনি জন্মেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের অবিমৃষ্যকারিতা আর অপরিণামদর্শিতার জন্য তিনি শেষরক্ষা করতে পারেননি। সায়েব বনবার অসার মোহে এবং বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে আসাকে জীবনের চরমতম সাধের পরিতৃপ্তি মনে করার ভ্রান্ত বিলাসে তিনি কাঞ্চন ফেলে কাঁচখণ্ড কুড়িয়ে তুলেছিলেন। তার মূল্যও তাঁকে দিতে হয়েছিল সেই পরিমাণেই—জীবনের সায়াহ্নভাগে চরম দারিদ্র্যক্লেশ আর স্বপ্নভঙ্গের মনস্তাপজনিত গভীর বেদনা তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে ভুলের মাশুল তাঁর কাছ থেকে সুদে-আসলে চড়া হারেই উসুল করে নিয়েছিল।

তবু মধুসূদন মধুসূদন। তাঁর জীবনের ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও কোথায়

যেন তাঁর ব্যক্তিত্বের ছকের সঙ্গে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী শিল্পীদের ছকের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রচণ্ড শক্তিমত্তার সঙ্গে এমন প্রচণ্ড বেহিসাবিপনার সহাবস্থান এদেশের সাহিত্য-সংসারের সদাবিদ্যমান আটপৌরে মনোভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার। মধুসূদন এ সমাজের গুটি-গুটি-পা-পা-করে-চলা ভীরু ও নিরীহ মানসিকতার মূর্তিমন্ত প্রতিবাদ-স্বরূপ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের এই দিকটিকে বড় চমৎকার করে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর এই অননুকরণীয় ছত্রগুলির মধ্যে—

"যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দ বোধ করিয়াছেন।...যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।"

শরৎচন্দ্র

জনপ্রিয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্রোহের মনোভঙ্গী-বিশিষ্ট একজন অসাধারণ শক্তিধর লেখক ছিলেন। তাঁর শিল্পী জীবনের ছাঁচ ইউরোপ-আমেরিকার এই বর্গের লেখকদের ছাঁচটিকে প্রবলভাবে মনে করিয়ে দেয়—সে ছাঁচ হলো একজন উড়নচণ্ডী অশান্ত ও অস্থিরচিত্ত ভবঘুরে লেখকের ছাঁচ। আমাদের দেশের মধ্যবিত্তসুলভ প্রতিপদে-নিয়ম-মানা গৃহগতপ্রাণ ভীত-চকিত শিষ্ট মনোভঙ্গীর সঙ্গে এই ছাঁচটির একেবারেই মেলে না। তবে শরৎচন্দ্রের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের এই খাতে অসম্পূর্ণতা ছিল। তিনি জীবনাচরণে যতবড় বিদ্রোহী ছিলেন, শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে ততবড় বিদ্রোহী ছিলেন না; জীবনটাকে তিনি সত্যিকারের একজন শাসন-বারণ-না-মানা বিপ্লবীর জীবনের মত যাপন করেছিলেন —কখনও গৃহ থেকে পলাতক হয়ে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে, কখনও

উদ্দেশ্যহীন যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করে, কখনও সমাজে পতিত নিষিদ্ধ-জনদের সংসর্গ করে, আবার কখনও বা রাজনৈতিক চরমপন্থীদের সঙ্গে মেলামেশা করে। কিন্তু শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর সেই বিদ্রোহের আবেগ অনেকখানি পোষমানা হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সম্ভবতঃ এ দেশের জলবায়ুর দোষেই এ রকমটা ঘটতে পেরেছিল। সাহিত্যসৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি এই বঙ্গীয় সমাজে বহুলপ্রচলিত মধ্যবিত্ত মানসিকতা ধৃত রক্ষণশীলতার সংস্কার অতিক্রম করতে পারেননি। গল্প ও উপন্যাস রচনাকালে রাঢ় দেশের কুলীন ব্রাহ্মণের সংস্কার—যে-সংস্কারের মধ্যে তিনি শৈশবে ও বাল্যে লালিত হয়েছিলেন—প্রতি পদে তাঁর হাত চেপে ধরেছিল বলে সন্দেহ হয়। নইলে যে মানুষ বিদ্রোহের এক দমকে ইন্দ্রনাথ (শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব), অভয়া (শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্ব), কিরণময়ী (চরিত্রহীন), সব্যসাচী (পথের দাবী), কমল (শেষপ্রশ্ন) প্রভৃতি সাহসিক নরনারীর চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন তিনি কেমন করে জীবনের শেষ ভাগে এসে কমললতার (শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব) মত ভক্তিময়ী বৈষ্ণবী নারীচরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন অথবা বিপ্রদাস উপন্যাসে বিপ্রদাস আর বন্দনার মত রক্ষণশীল ভাবের দ্যোতক নরনারীর চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন সে একটা প্রহেলিকা হয়েই রইলো। মানসিক গঠনের মধ্যে এককালীন প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার সমাবেশের কারণ ছাড়া এ জিনিসের আর কোন ব্যাখ্যা হয় না।

আসলে শরৎচন্দ্র ব্যক্তিজীবনের বিদ্রোহকে তাঁর সাহিত্যে পুরাপুরি কাজে লাগাতে পারেননি, পারলেও আংশিকভাবে মাত্র পেরেছিলেন। তাঁর প্রথম বয়সের ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে ভবঘুরে স্বভাবকে সমর্থন না করেও ওই স্বভাবের ভিতর যে-প্রচলিত নিয়ম-নীতিবিরুদ্ধ সৃষ্টিশীল আগুনের দীপ্তি লুকানো ছিল তাকে অবশ্যই সমর্থন করা চলে, সমর্থন করা উচিত। তাঁর বোহিমিয়ান আচার-আচরণ নৈষ্ঠিক নৈতিকতার মানদণ্ডে গর্হনীয় কিন্তু সৃজনী আবেগের উদ্দীপক রূপে তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রভূত সহায়ক। পাশ্চাত্যের বেশ কিছু কবি ও শিল্পীর (যেমন মোপাসাঁ,

গর্কি, বোদলেয়ার-র‍্যাবো-ভারলেন প্রমুখ) জীবনে এই রকম অদ্ভুতের লীলাই আমরা দেখতে পাই। শরৎ-সাহিত্যের আংশিক অসার্থকতা এখানে যে, তাঁর ব্যক্তি-জীবনের বিদ্রোহ-বিপ্লবের অভীপ্সা শিল্পী-জীবনের অনুষঙ্গে এদেশের মধ্যবিত্ত মানসিকতার বেনোজলে কম-বেশী আটকে গিয়েছিল, ফলে প্রতিবাদী ও প্রতিরোধী সাহিত্য যেমনটা তিনি সৃষ্টি করতে পারতেন তেমনটা হয়নি। এ বাংলা সাহিত্য, বাংলা সমাজেরই দুর্ভাগ্য।

কাজী নজরুল

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিশীল বিদ্রোহী জীবনের মেয়াদ এক দশক কাল মাত্র, তার বেশী নয়। ১৯২০ সালে করাচীর পল্টন-ব্যারাক থেকে ফিরে আসার পর তাঁর সত্যিকারের কাব্যজীবনের শুরু এবং তিরিশের দশকের সূত্রপাত থেকেই বলা যায় তাঁর কাব্যজীবন শেষ হয়ে গীতিকার ও সুরকার জীবন পাকাপোক্ত রূপে আরম্ভ হয়। নজরুলের সৃজনী ব্যক্তিত্বের এই দুটি পর্বের ভিতর মনোভঙ্গীর দিক দিয়ে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। প্রথম পর্বে বিদ্রোহী মানসিকতার আধিক্য (তাঁর সাম্যবাদী কবিতাগুলি এই পর্বেরই রচনা এবং সংগীত রচনারও যাকে বলে জাতীয়তাবাদী, আন্তর্জাতিকতাবাদী ও শ্রমিক-কৃষকজাগরণ-বিষয়ক গীতি প্রণয়নের অধ্যায় তারও চর্চা এই পর্বে); কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে বিদ্রোহ-বিপ্লবের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে তিনি কার্যতঃ বিশুদ্ধ গানরচনা আর সুর যোজনার জীবিকার কোলেই আত্মসমর্পণ করেছিলেন বলা যায়। তখন আর তাঁর কাব্যে ও গানে বিপ্লবের বিদ্রোহের, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সুরের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট ছিল না। ভাঙার গান না গেয়ে তিনি তখন প্রেমের ও ভক্তির গানে মেতে উঠেছিলেন। এই পর্বেও অবশ্য নজরুল অসামান্য সৃজনী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তবে সে ভিন্ন গোত্রের প্রতিভা, বিদ্রোহী প্রতিভা তাকে বলা যায় না।

নজরুলের জীবনে এমনতর পরিবর্তনের কী কারণ? প্রতিকূল

সমাজ-ব্যবস্থার পীড়ন ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, সঙ্গ ও আবেষ্টনীর বদল (১৯২৯ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর সাহিত্যজীবনের ঘনিষ্ঠ সহযোগীস্বরূপ মুজফ্ফর আহমদ, আব্দুল হালিম প্রমুখ কম্যুনিস্ট বন্ধুরা গ্রেপ্তার হয়ে পড়ায় তিনি তাঁর বিশের দশকের অভ্যস্ত বিপ্লবী পরিবেশ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন), জীবিকা নির্বাহের সমস্যা, ব্যক্তিজীবনের কতকগুলি মর্মান্তিক ঘটনা (পুত্রবিয়োগ, পত্নীর পক্ষাঘাত ব্যাধি ইত্যাদি), এবং সর্বোপরি এ দেশের আকাশে-বাতাসে পরিব্যাপ্ত সনাতন ধর্মীয় মানসিকতার প্রভাব। স্পষ্টতই এই সমস্ত কারণের সম্মিলিত প্রভাবের ফলে তাঁর সৃষ্টির আবেগ এক খাত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে পরিচালিত হয়েছিল। জীবিকার প্রাণান্তিক তাগিদে নজরুলকে গ্রামোফোন কোম্পানীর ব্যবসায়িক ফরমায়েসের অনুবর্তী হয়ে বিচিত্র ধরনের গান রচনায় আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল, যা হয়ত সব সময় তাঁর অভিপ্রায়ের অনুমত ছিল না, কিন্তু নিরুপায় হয়ে তাঁকে সে ফরমায়েস খাটতে হয়েছে। নিজের অভিপ্রেত পথে স্বাধীনভাবে বাঁচবার পরিবেশ পেলে নজরুল হয়ত পূর্বেরই মত বিদ্রোহ-বিপ্লবেরই পোষকতা করে যেতেন তাঁর কবিতা ও গান রচনার মধ্য দিয়ে। কিন্তু নজরুলের ভাগ্যে সে জিনিস লেখা ছিল না। এদেশের গতানুগতিক প্রতিবেশ ও তৎপ্রসূত মূল্যবোধ তাঁর বিদ্রোহের অগ্নিবাষ্পের উপর হিম নীহারিকার ঠাণ্ডা-আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছিল, তাতে করে তাঁর বিদ্রোহের আগুন জল হয়ে গিয়েছিল।

অবশ্য নজরুলের সংগীত সৃষ্টির অধ্যায়ও এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। কিন্তু তার আলোচনার স্থান এটা নয়। কৌতূহলী পাঠক এ প্রসঙ্গে মদীয় 'কাজী নজরুলের গান' বইটি নেড়েচেড়ে দেখতে পারেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপ্যাধায়ের মত বিদ্রোহী প্রতিভা বোধ হয় আর দ্বিতীয় জন্মাননি। তিনি তাঁর একাধিক উপন্যাসে ও ছোটগল্পে বাংলার মধ্যবিত্ত মানসিকতা ও তাঁর ভাষায় যাকে বলে

'ভদ্র'লোগামি' তাকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেছিলেন। বস্তুতঃ বাঙালী শহুরে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভণ্ডামি কাপট্য ও কৃত্রিম মূল্যবোধগুলির বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর আজীবনের জেহাদ। 'সমুদের স্বাদ' গল্পগ্রন্থের নতুন সংস্করণের (১৩৫২) ভূমিকায় মানিক লিখেছিলেন—"প্রথম বয়সে লেখা আরম্ভ করি দুটি স্পষ্ট তাগিদে—একদিকে চেনা চাষী মাঝি কুলী মজুরদের কাহিনী রচনা করার, অন্যদিকে নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে মূর্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে সচেতন করার। মিথ্যার শূন্যকে মনোরম করে উপভোগ করার নেশায় মরমর এই সমাজের কাতরানি গভীরভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল। ভেবেছিলাম ক্ষতে ভরা নিজের মুখখানাকে অতি সুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা যদি নিষ্ঠুরের মত মুখের সামনে আয়না ধরে ভেঙে দিতে পারি, সমাজ চমকে উঠে মলমের ব্যবস্থা করবে। তখন জানা ছিল না যে ওগুলি জীবনযুদ্ধের ক্ষত নয়, জরার চিহ্ন ; ভাঙনের ইঙ্গিত ; জানা ছিল না যে, স্বাভাবিক নিয়মেই এ সমাজের মরণ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী এবং তাতেই মঙ্গল—সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভেঙে বিরাট জীবন্ত সমাজে আত্মবিলোপ ঘটার মধ্যেই আগামী দিনের অফুরন্ত সম্ভাবনা।"

কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্বপ্ন তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনে পুরাপুরি সার্থক করে যেতে পারেননি। বর্তমান সমাজের অনুন্নত মানসিক স্তর, পশ্চাৎটান, গতানুগতিক মূল্যবোধ ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর দৈহিক ব্যাধি, সুরাসক্তি (নানাবিধ চিকিৎসায় সুফল লাভে ব্যর্থ হয়ে এপিলেপ্সি বা মৃগী রোগের কবল থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় তাঁর প্রথম নেশার কোলে আত্মসমর্পণ), পারিবারিক অভাব-অনটন ইত্যাদি বিচিত্র কারণ সংযুক্ত হয়ে জীবনের অর্ধপথেই তাঁর আয়ুতে ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিল। মাত্র আটচল্লিশ বছরের আয়ুষ্কাল (১৯০৮-১৯৫৬) তিনি পেয়েছিলেন। অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেও তিনি এই সমাজের প্রবহমান মধ্যবিত্ত মানসিকতার বলি হয়েছিলেন। তাঁর মূল্যবান জীবনের অবসান ঘটেছিল এ সমাজের সহস্রবিধ পেছুটানের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ করতে

করতে ক্লান্ত হয়ে ওঠার ফলে। যে-মধ্যবিত্ত কাপট্য ভণ্ডামি মিথ্যার শূন্যতার সঙ্গে শিল্পের স্তরে তাঁর বরাবরকার সংগ্রাম ছিল, সেই সমস্ত অপলক্ষণ আজও আমাদের সমাজে সমান দাপটে বিরাজমান। দীর্ঘদিনের চেষ্টার পরও গতানুগতিকতার দুর্গে সামান্যই ফাটল ধরানো গেছে।

আমি আমার একাধিক প্রবন্ধে এই বলে বরাবর আক্ষেপ করে এসেছি যে, আমাদের সাহিত্যে কেন ভলটেয়ার, বার্নার্ড শ'র মত সমালোচক প্রতিভার আবির্ভাব হয় না (মদীয় 'সাহিত্য ভাবনা' গ্রন্থের "ভলটেয়ার ও বার্নার্ড শ"" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু আক্ষেপটি দুঃখজনক হলেও অতিমাত্রায় সত্য। আমাদের সাহিত্যে সাহিত্যসমালোচনার ঐতিহ্য আছে কিন্তু সাহিত্যসমালোচনার সহযাত্রী সমালোচনার আরেকটি যে ধারা আছে—সমাজসমালোচনা—তার ঐতিহ্য মোটেই পুষ্ট নয়। সমাজ-সমালোচনায় বিপদের ঝুঁকি আছে, লাঞ্ছনা-নিপীড়নের ভয় আছে, আত্মত্যাগের কষ্ট আছে, তাই ওই পথে কেউ অগ্রসর হতে চায় না, সকলেই সাহিত্যসমালোচনার এলাকায় কেন্দ্রীভূত। সাহিত্য-সমালোচনার এলাকায় কেন্দ্রীভূত, তার কারণ এই এলাকাটি তুলনায় অনেক বেশী নিরাপদ এবং অল্পবিস্তর মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ দ্বারা শাসিত বিধায় অনেক কম বিক্ষুব্ধ ও অশান্ত। জীবনের সহজাভ্যস্ত আরাম-স্বাচ্ছন্দ্যের বিঘ্ন না ঘটিয়ে এবং প্রতিষ্ঠা বিপন্ন না করে এই এলাকায় অবাধে বিচরণ করা চলে। কিন্তু সমাজ-সমালোচনার এলাকায় তেমন নয়। সেখানে পদে পদে বাধা—আরাম ক্ষুণ্ণ হওয়ার বাধা, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার বাধা, এমনকি নিগৃহীত-অত্যাচারিত হওয়ার আশঙ্কা। রাজরোষ এবং সমাজরোষ এই শেষোক্ত শ্রেণীর সমালোচকদের মাথার উপর ডেমোক্লিসের তরবারির মত সর্বদা ঝুলেই আছে। কাজেই লেখকেরা ওই পথ সহজে বড় একটা কেউ মাড়াতে চান না, প্রায় সকলেরই ঝোঁক সাহিত্য-সমালোচনার দিকে।

তাই বলছিলাম বঙ্গীয় শিল্প ও সংস্কৃতির সীমানায় সমাজ-সমালোচনার

সরণী বিরল-পথিক। ফরাসী সাহিত্যে রুশো, ভলটেয়ার, হলবাক, দিদেরো, জোলা, আনাতোল ফ্রান্স, রোলাঁ; ইংরেজী সাহিত্যে মিলটন, সুইফট, স্টার্ন, ডিফো, বার্নার্ড শ', বার্টর‍্যাণ্ড রাসেল; রুশ স্যাহিত্যে বেলিনস্কি, হার্জেন, নেক্রাসভ, বাকুনিন, ক্রপটকিন, টলস্টয়, চার্নিশেভ্‌স্কি, দোব্রুল্যুবভ প্রমুখ মনীষীরা যে-অর্থে সমাজ-সমালোচক ছিলেন আমাদের সাহিত্যে সে-অর্থে সমাজ-সমালোচক খুব অল্পই আবির্ভূত হয়েছেন এখন পর্যন্ত। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, বিনয় সরকার, মোহিতলাল মজুমদার, বিনয় ঘোষ প্রমুখ কিছু বাঙালী মনস্বী সমালোচকদের সমালোচনার ধারায় সমাজ-সমালোচনার পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু তাঁদের কাউকেই তাঁদের সমালোচনাকর্মের জন্য তেমন গভীর মূল্য দিতে হয়নি যে-মূল্য দিতে হয়েছে ফরাসী সাহিত্যে রুশোকে ভলটেয়ারকে রোলাঁকে, ইংরেজী সাহিত্যে মিলটন-সুইফট-শ'-রাসেলকে কিংবা রুশ সাহিত্যে বেলিনস্কি-হার্জেন-টলস্টয়-চার্নিশেভ্‌স্কি-দোব্রুল্যুবভ প্রমুখ সমালোচকদের।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাজতন্ত্র-যাজকতন্ত্র-অভিজাততন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করায় ভলটেয়ার প্যারিস থেকে পলায়ন করে আত্মরক্ষার্থে তিন বছরের জন্য ইংলণ্ডে গিয়ে বনবাস করতে বাধ্য হন, পরে ফ্রান্স আর সুইজারল্যাণ্ডের সীমান্তস্থিত ভার্নি নামক জায়গায় স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করে কাল কাটাতে থাকেন; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরোধিতা করায় রাসেল কারারুদ্ধ হন ও তাঁর অধ্যাপনার চাকরিটি খোয়ান এবং রোলাঁ সুইজারল্যাণ্ডে নির্বাসিত হন; সমাজপরিবর্তনের লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ স্বাধীনতার পক্ষে আজন্ম-যোদ্ধা রুশ সমালোচক বেলিন্‌স্কি পরাক্রান্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অকালে ক্ষয়রোগে প্রাণত্যাগ করেন, হার্জেন তাঁর নির্মম বাস্তববাদী সমালোচনার জন্য রুশ দেশ থেকে উৎখাত হন; টলস্টয় তাঁর স্বাধীন ধর্মমতের কারণে রুশ অর্থোডক্স চার্চ থেকে বিতাড়িত হন; নির্ভীক সমাজতান্ত্রিক-বাস্তববাদী সমালোচনার জন্য চার্নিশেভ্‌স্কিকে ছদ্ম মৃত্যুদণ্ড, আট বছরের

সশ্রম কারাবাস, সাইবেরিয়ায় নির্বাসন ও খনির অন্ধকারে কাজ করতে বাধ্য হওন, সাইবেরিয়া থেকে মুক্তির পর রুশ দেশের সুদূর দক্ষিণাঞ্চলে জবরদস্তিমূলক প্রবাসজীবন যাপন প্রভৃতি একের পর এক চূড়ান্ত রকমের নিগ্রহ সইতে হয়েছিল একটানা একুশ বছর যাবৎ; তাঁর ভাবশিষ্য দোব্রল্যুবভকেও তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে মতামতের জন্য কম কষ্টভোগ করতে হয়নি। আমাদের দেশের কজন লেখক আছেন যাঁরা তাঁদের মতের স্বাতন্ত্র্যের জন্য এবংবিধ নির্যাতনের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত ছিলেন বা আছেন? এরকম সাহসিক বীরত্বের সংস্কার কি আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত আছে মধুসূদন-শরৎ-নজরুল-মানিকের উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও?

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন থেকে যতদিন পর্যন্ত না ভীরু-সন্ত্রস্ত নিরীহ ও শান্ত মধ্যবিত্ত মানসিকতার ঐতিহ্য বিদূরিত হচ্ছে ততদিন এ সাহিত্যের যথার্থ মুক্তি নেই।

☐ সাহিত্যে রুচি বদল ☐

প্রতি যুগেই সাহিত্যের রুচি পাল্টায় এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। তবে গোড়াতেই বলা আবশ্যক যে, সাহিত্যের রুচি বদল বলতে লেখক এবং পাঠক দুইয়েরই রুচি বদল বোঝাচ্ছে। বস্তুতঃ ওই দুই বদল আপেক্ষিক, একে অপরের উপর নির্ভরশীল। লেখক তাঁর নতুন বক্তব্য, দৃষ্টিভঙ্গী ও আঙ্গিকের দ্বারা পাঠকের রুচিকে প্রভাবিত করেন ; পক্ষান্তরে, পাঠক তাঁর যুগোচিত চাহিদার দাবি চাপান লেখকের উপরে।

দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হতে পারে। এবং যেহেতু বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আমাদের সকলের স্বাভাবিক প্রাণের প্রীতিতে অনুরঞ্জিত, সেই কারণে বাংলা সাহিত্য থেকে দৃষ্টান্ত উৎকলন করলে সেটা সবারই মনঃপূত হবে বলে আশা করি।

সাহিত্যের রুচি যে যুগ থেকে যুগে কীভাবে পাল্টায় তার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শনস্থল রবীন্দ্র-সাহিত্য। এমনকি রবীন্দ্র-সাহিত্যের স্বকীয় সীমার মধ্যেও এক অধ্যায়ের সঙ্গে অন্য অধ্যায়ের সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। যুগের আবহই এমনটা ঘটিয়েছে বলে মনে করবার কারণ আছে।

রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী যুগের কাব্যে মাইকেল-হেম-নবীন এবং তাঁদের অনুবর্তী কবিদের বাহিত আখ্যায়িকা কাব্যের সংস্কারটাই ছিল প্রবল। কাব্যের ধ্বনি ছিল শব্দাড়ম্বরময় ও ওজোগুণবিশিষ্ট এবং ছন্দ ছিল পয়ার ও ত্রিপদীর কঠিন নিগড়ে বাঁধা। যাকে বলে ক্লাসিক বা চিরায়ত রীতি, কাব্য ছিল কমবেশি তার শাসনে শৃঙ্খলিত—রোমান্টিক গীতিকবিতার আমেজ তখনও বাংলা কাব্যে একটি অস্ফুট লক্ষণ মাত্র। কিন্তু দেখা গেল কালক্রমে এই শেষোক্ত লক্ষণটিই বাংলা কাব্যের প্রধান সুর হয়ে উঠেছে এবং ওই সুরটিকে ঘিরে এক শক্তিমান নতুন কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছে বাংলা ভাষায়—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় বড়াল,

কামিনী রায়, সর্বোপরি বিহারীলাল। বিহারীলালে বাংলা কবিতার মোড় ঘুরে গেল—বাংলা কবিতা ধ্রুপদী কাব্যের পুরনো খাত ছেড়ে গীতি-কবিতার নতুন খাতে বইতে লাগল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই নতুন গতিবেগকেই সম্পূর্ণতা দিলেন তাঁর কাব্যে। সম্পূর্ণতা ছন্দ প্রকরণে, ভাষা ও ভাবের নবীনতায়, শিল্প-সৌন্দর্যের অনির্বচনীয় স্ফূর্তিতে। একটা নতুন যুগের সূচনা হলো রবীন্দ্রকাব্যে। বাংলা সাহিত্যের রুচি গেল পাল্টে। কাব্যামোদীদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল ধাতের, তাঁরা রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে অস্পষ্টতা (নিত্যকৃষ্ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল, রমাপ্রসাদ চন্দ), দুর্নীতি দ্বিজেন্দ্রলাল), আত্যন্তিক অতীন্দ্রিয়বাদ (শশাংকমোহন সেন), বস্তু-তন্ত্রহীনতা (বিপিনচন্দ্র পাল, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতি নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির অভিযোগ তুললেন। কিন্তু কোন অভিযোগই শেষ অবধি ধোপে টিকল না—কবির নব নব সৃষ্টিপ্রতিভার প্রাণপ্রাচুর্যের বন্যায় সর্ববিধ অভিযোগ আর সমালোচনা তৃণখণ্ডের মত ভেসে গেল। রবীন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ কবি রূপে বাঙালীর হৃদয়-সিংহাসনে অপ্রতিবাদ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। গীতিকবিতার চরম উৎকর্ষ ঘটল বাংলা কাব্যে।

মহৎ কবি মাত্রেরই অনুসরণ ও অনুকরণের একটা রেওয়াজ গড়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শকে বেষ্টন করে এক বিশিষ্ট রবীন্দ্রানুসারী কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাব হলো বাংলায়। এঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রতিনিধিস্থানীয় কবি হলেন—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

কিন্তু মৌলিকতার জোর না থাকলে অনুকরণ-অনুসরণে খুব বেশী দূর এগোনো যায় না। একটা আদর্শ কাব্যরীতিকে অপরিবর্তনীয় স্টাইল হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর উপর অন্তহীনভাবে দাগা বুলনো হতে

থাকলে এক সময় না এক সময় সে অভ্যাসের প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই। হলোও তাই। পূর্বোক্ত রবীন্দ্রানুসারী কবিদের কারও কারও জীবদ্দশাতেই এই অভিযোগ উঠল যে, সত্যিকার কবি হতে গেলে যে কল্পনা-কুশলতা ও সৃষ্টির উল্লাস দরকার এঁদের কবিতায় তা বড় একটা খুঁজে পাওয়া যায় না; এঁরা আসলে পদ্যকার (ভার্সিফায়ার) মাত্র। শুধু তাই নয়, এঁদের গতানুগতিকতার লক্ষণ-চিহ্নিত কাব্য-কবিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের স্রোতোমুখে দেখা দিলেন কয়েকজন যথার্থ শক্তিধর নবীন কবি, কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত যাঁদের প্রতীক স্বরূপ। নজরুল তাঁর সাম্যবাদ, মোহিতলাল তাঁর দেহাত্মবাদ, আর যতীন্দ্রনাথ তাঁর দুঃখবাদের দ্বারা বাংলা কবিতায় তিনটি সম্পূর্ণ নতুন ধারার সংযোজন ঘটালেন। এই তিন পথে পরে আরও অনেক কবির পদপাত ঘটেছে, যার ফলে বাংলা কবিতার পূর্বতন গীতিধর্মী (লিরিক্যাল) রূপটি আর অপরিবর্তিত নেই, তা বিশুদ্ধ সৌন্দর্য আর আনন্দের বর্ত্ম ছেড়ে জনগণমনের সরণীতে প্রবেশ করেছে। হয়ত বাংলা কবিতায় আজও, খতিয়ে দেখতে গেলে, গীতিধর্মিতাই প্রবল কিন্তু তার গোত্রান্তর হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই রুচিবদলের আবেগ প্রবলভাবে অনুভব করেছেন তাঁর উত্তর-জীবনের সাহিত্যসৃষ্টির অধ্যায়ে। তার সুস্পষ্ট প্রতিফলনও ঘটেছে তাঁর ওই সময়কার রচনাবলীতে। ষাট-পূর্ব আর ষাটোত্তর রবীন্দ্রকাব্যের সুরে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। প্রভাত-সঙ্গীত থেকে শুরু করে বলাকা পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যের কমবেশি নিরবচ্ছিন্ন এক ধারা; আর বলা যেতে পারে পুনশ্চ থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত আরেক ধারা। শেষের দিকের রচনায় সচেতন ভাবে প্রবেশ করেছে গণমানসিকতার সুর, স্বপ্নভঙ্গের বেদনার সুর, এমনকি, যা প্রায় অবিশ্বাস্য, আস্তিক্যবুদ্ধিতে সংশয়ের সুর। এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে যুগরুচির ক্রমবর্ধমান প্রগতিশীল ঝোঁকের অভিঘাতের টানে। নৈবেদ্য আর গীতাঞ্জলির কবি রবীন্দ্রনাথ আর

ধরা যাক, প্রান্তিক আর জন্মদিনের কবি রবীন্দ্রনাথকে এক বলে চেনা দুষ্কর।

বাংলা কথাসাহিত্যেও একই প্রকার রুচিবদলের ঝোঁক চোখে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের পরবর্তী কথাকারদের দৃষ্টিভঙ্গী, রচনারীতি, ভাষা ব্যবহার, বর্ণিত পরিবেশ ও চরিত্র ইত্যাদি বিচার করলে দেখা যায় যুগ থেকে যুগে কত পার্থক্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পরিবেশে সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার প্রভাব প্রবল, নায়ক-নায়িকারা উচ্চকুলোদ্ভব, বর্ণনা বর্ণাঢ্য ও ভাষা ধ্বনিময়। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসের চিত্র ও চরিত্রকে নগরজীবনে স্থানান্তরিত করে তার ভিতর বিদগ্ধ উচ্চবিত্ত সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। ঐতিহাসিক বা সামাজিক রোমান্সের কুহক কাটিয়ে উঠে তিনি তাঁর বিষয়-বিন্যাসে ও চরিত্রায়ণে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক রীতির প্রয়োগ করেছেন এবং ভাষাও তদনুপাতে হয়ে উঠেছে বঙ্কিমের তুলনায় অনেক সহজ ও একালীন স্বাদগন্ধযুক্ত। চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা পর্যন্ত রচনার এই ছাঁচ। কিন্তু তারপরেই, কী আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথ উত্তর-জীবনের রচনায় আপনি আপনাকেই অতিক্রম করেছেন। চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরে, শেষের কবিতা ও যোগাযোগ যে চোখের বালি ও নৌকাডুবির লেখকের রচনা, তা আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বাস করা কঠিন। শুধু যে বিষয়েরই বদল ঘটেছে তা নয়, ভাষার চালও গেছে বদলে। ইতোমধ্যে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আলোড়ন-বিলোড়নকারী প্রভাব, সবুজ পত্রের ভাষা-আন্দোলন, বাংলা কথাসাহিত্যে কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক নূতন পর্বের সূচনা, বাস্তববাদী রচনার চাহিদা বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা চাপ রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যের গোত্রান্তর ঘটিয়েছে বললেও চলে এই কালে। শেষের কবিতার স্টাইলের উজ্জ্বল প্রাখর্য, গতিময়তা ও উল্লাসের পাশে রেখে বিচার করলে পূর্ব যুগের রবীন্দ্র-উপন্যাসের স্টাইল কতই না ভারী, মন্থর আর গভীর-গম্ভীর বলে মনে হবে। যুগধর্মের কারণেই এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের প্রধান গৌরব তাঁর স্টাইলের জাদুতে। বিষয়ের ও চরিত্রের গণতান্ত্রিকীকরণও তাঁর অন্যতম মুখ্য কৃতিত্ব। বঙ্কিমচন্দ্রের মত তিনিও তাঁর গল্পোপন্যাসে মূলতঃ গ্রামজীবনকেই অবলম্বন করেছেন, তবে এই গ্রাম ভিন্নতর গ্রাম—জমিদারী ভূমি-ব্যবস্থার বর্ণ-বহুলতা ও আড়ম্বর তাতে অনুপস্থিত। শরৎচন্দ্র তাঁর অনবদ্য ছোট-গল্প ও উপন্যাসগুলিতে যে সব নরনারীর ছবি এঁকেছেন তাদের বেশীর ভাগই পল্লীর সাধারণ জীবনের স্তর থেকে আহৃত। এই প্রক্রিয়াটিকেই পরে আরও অনেক বেশী সম্প্রসারিত ও সার্থক করেছেন বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের রচনায়। অন্যদিকে কল্লোলের লেখকেরা, যথা জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, যুবনাশ্ব প্রমুখেরা শহরের নীচুতলা ও খনি অঞ্চলের কুলী-কামিনের জীবনকে করেছেন চিত্রিত তাঁদের বাস্তববাদী কথাসাহিত্যের ধাঁচ-ধরনের ভিতর।

বাস্তবতার নিরিখে এঁদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বাংলা সাহিত্যে একটি সম্পূর্ণ নূতন আয়তন যোগ করেছেন তাঁর মৌলিক শিল্পদৃষ্টির সহায়ে। এই মৌলিক শিল্প-দৃষ্টির আসল কথা হলো : তিনি শুধু কল্লোলের লেখকগোষ্ঠী ও অন্যান্যদের ধরনে অত্যাচারিত ও দুর্গত শ্রেণীর মানুষদের দুঃখ-বেদনার ছবি এঁকেই ক্ষান্ত থাকেননি, সেই দুঃখ-বেদনার প্রতিকার কেমন করে করতে হয় তারও একটা প্রকরণ বাতলে দিয়েছেন। অর্থাৎ সমস্যা ও সমাধান এই দুয়েরই ইঙ্গিত আছে তাঁর লেখায়। সংগ্রাম আর প্রতিরোধের পথকে তিনি দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ মর্যাদা। মানিক একাধারে শিল্পী ও অ্যাকটিভিস্ট (ক্রিয়াশীল) এই দুইয়ের এক সুষ্ঠু সমন্বয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য সুস্পষ্ট রুচিবদল তথা যুগ-বদলের তাৎপর্য বহন করছে। ওই তাৎপর্য থেকে প্রয়োজনীয় সঙ্কেত গ্রহণ করে বাংলা কথাসাহিত্যের নূতন দিগ্‌দর্শন হওয়া উচিত বলে মনে করি।

☐ ছোটগল্পের উৎকর্ষ নিরূপণের মানদণ্ড ☐

ছোটগল্পের উৎকর্ষ কিসে নিহিত? সে কি তার সমাপ্তির চমকে, নাকি তার কাহিনী বিন্যাসের নৈপুণ্যে, নাকি রসের প্রগাঢ়তায়, নাকি তার প্রবল ভাবাবেগের আবেদনের মধ্যে? নাকি তার আর কোন শিল্প-লক্ষণের ভিতর? কেউ বলবেন ছোটগল্পের আসল সৌন্দর্য নিহিত তার উপসংহারের অপ্রত্যাশিত আকস্মিক মোড়-ঘুরিয়ে দেওয়া বিবৃতির মধ্যে। যেমন মোপার্সাঁ'র 'নেকলেস', শেখভের 'বাজী', রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' এবং 'জীবিত ও মৃত', প্রভাতকুমারের একাধিক ছোটগল্প, তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি' ও 'অগ্রদানী', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' অথবা 'ফেরিওলা', বনফুল-মনোজ বসু-প্রবোধ সান্যাল-সুবোধ ঘোষ-বিমল মিত্র প্রমুখের ক্ষুদ্রায়তন মাঝারি বড় অনেক অনেক ছোটগল্প।

কেউ বলবেন উপসংহারের আকস্মিক চমক সৃষ্টিতে শিল্পের চাতুর্য নিশ্চয়ই প্রকাশ পায় এবং পাঠক তার থেকে এক ধরনের অপ্রস্তুত বিস্ময়-বোধের আনন্দ পান নিঃসন্দেহে, কিন্তু এই চমক মূলতঃ বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতের ব্যাপার, পাঠকের সমগ্র সত্তাকে রসাবেশে ভাবাবেগে আমূল নাড়া দেবার ক্ষমতা এই চমকের নেই। তাক লাগানো সমাপ্তিকে ইংরেজীতে বলে **whip-crack ending**। কথাটার শব্দ ব্যবহার লক্ষ করলেই বোঝা যায় চাবুকের আঘাতের মত আকস্মিক হানা হেনে মনকে সচকিত করে তোলাই এমনতর গল্পের উপসংহার ভাগের লক্ষ্য; ভাবের আলোড়িত মথিত আপ্লুত আবেগ সৃষ্টি করে তার তোড়ে পাঠককে ভাসিয়ে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা এমত ক্ষেত্রে গল্পকারের থাকে না। সুতরাং এমন গল্পকে কোনক্রমেই শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের শিরোপা দেওয়া চলে না।

কথাটা অযথার্থ বলতে পারিনে। নিছক সমাপ্তিকালীন চমক সৃষ্টির আকস্মিকতাই যদি ছোটগল্পের উৎকর্ষের একমাত্র মানদণ্ড হতো তাহলে বনফুলের যে-কোন ছোটগল্প অথবা প্রমথ চৌধুরীর 'চার-ইয়ারী কথা'র গল্পচতুষ্টয় বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পরূপে অপ্রতিবাদ্য স্বীকৃতি পেত কিন্তু কার্যতঃ আমরা দেখি, এমনতর স্বীকৃতি এই গল্পগুলিকে দেওয়া হয়নি। সুতরাং ছোটগল্পের নিঃসন্দিগ্ধ উৎকর্ষের নিশ্চয়ই অন্য কোন মানদণ্ড আছে, যার সন্ধান আমাদের নিতে হবে।

উপরে ক্লাইম্যাক্সে চমকসৃষ্টিকারী গল্পের নিদর্শনরূপে রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত', তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি' ও 'অগ্রদানী', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' ও 'ফেরিওয়ালা' প্রভৃতি গল্পের উল্লেখ করা হয়েছে ঠিক কথা, কিন্তু সব গল্পের শেষাংশই তাদের গল্পের উৎকর্ষের একমাত্র বিচার্য বিষয় নয়; সেই সব গল্পের রসগাঢ়তা নিহিত আছে গল্পগুলির কারুণ্যে, বেদনায়, ট্রাজিক অনুভবের আর্তিতে। "কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে মরে নাই"—জীবিত ও মৃত গল্পের এই উপসংহার নিশ্চয়ই একটি সংবিৎ জাগানো বিবৃতির অপ্রত্যাশিত চমক এনে দেয় পাঠকের মনে, কিন্তু এই অনবদ্য গল্পের আবেদনের অনন্যতা অন্যত্র অনুসন্ধেয়। এক অসহায় পল্লীবধূ বেঁচে থেকেও আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী পরিজন কর্তৃক মৃত বলে পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে সে অপরিসীম নিরুপায়তায় এ দুয়ার থেকে ও দুয়ারে ছুটে বেড়াচ্ছে এবং প্রাণপণে মাথা কুটে প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে, সে মরে নাই সে বেঁচে আছে—এর যে মর্মস্পর্শী দুঃখের আকূতি সেই ট্রাজিডির বেদনা গল্পটিকে এক অসামান্য শিল্পোৎকর্ষ মণ্ডিত করেছে। শেষের বাক্যটির চমক ওই ট্রাজিডিরই ঘনীভূত চূড়ান্ত রূপ, নিছক চমকে দেওয়ার জন্যই চমকানো বিবৃতি নয়।

তেমনি তারাশঙ্করের তারিণী মাঝি ও অগ্রদানী গল্প। গল্প দুটি ভাবাবেগের গভীরতায় পাঠক-মনের অতল স্পর্শ করে বললেও চলে। বেদনার কারুণ্যে ও ট্রাজিক রসের আবেদনে রচনা দুটির বুঝি তুলনা নেই। তারাশঙ্কর তাঁর 'আমার সাহিত্য জীবন' বইতে এই প্রথম মামীয়

গল্পটির বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন এই গল্প-রচনার পট-ভূমিতে আছে তাঁর কন্যাবিয়োগের শোকের গভীর ছায়া। সদ্য হারানো মেয়ের অভাবজনিত শূন্যতার বিষাদ তাঁকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে তাঁর চেতনার অগোচরেই ওই শোকবিধুর ঘটনার প্রভাব গিয়ে পড়েছিল গল্পটির ঘটনাবৃত্তের আদলের উপর। পরে এই লেখকের কাছে প্রসঙ্গটিকে আরও বিস্তারিত করতে গিয়ে তারাশঙ্কর বলেছিলেন, তারিণী মাঝি গল্পটি শেষ করার পর তিনি ওই গল্পের পৃষ্ঠার উপরেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন ভাবাবেগের আতিশয্যে। অর্থাৎ গল্পের বেদনা আর নিজের ব্যক্তি-জীবনের বেদনা তন্মুহূর্তে এমনভাবে একীভূত হয়ে গিয়েছিল যে তিনি আর নিজেকে চেপে রাখতে পারেননি, নিজের কন্যা হারানোর শোকেরই প্রতিমূর্তি তিনি দেখতে পেয়েছিলেন বন্যার জলে ভেসে যাওয়া অগণিত গ্রামের মানুষের বিপর্যয়ের বেদনায় কাতর তারিণী মাঝির মর্মন্তুদ হাহাকারের মধ্যে। শিল্পের বিষয়ের সঙ্গে রচয়িতার এই-জাতীয় সাযুজ্য বা identification-কেই টলস্টয় শ্রেষ্ঠ আর্টের লক্ষণ বলে নির্দেশ করেছেন। বিষয় ও বিষয়ীর এই একীভবন শিল্পের চাতুর্যের এলাকায় বিরাজ করে না, বিরাজ করে না বুদ্ধিগ্রাহ্যতার সীমানায়; বিরাজ করে গভীর ভাবাবেগের দ্বারা মথিত শিল্পীর অন্তরের আলোড়নের মধ্যে। এই আলোড়নই পরে পাঠক-হৃদয়ে সংক্রমিত হয়।

অগ্রদানী গল্পের শেষে যে-চমক রয়েছে তার আকস্মিকতা পাঠকমনে অপ্রত্যাশিতের দোলা জাগায় ঠিক, কিন্তু ওই চমক গল্পটির কেন্দ্রীয় মনোযোগের বিষয় নয়; কেন্দ্রীয় মনোযোগের বিষয় হলো গ্রামের ক্ষুধার্ত লোভী ব্রাহ্মণ পূর্ণ চক্রবর্তীর সীমাহীন দারিদ্র্যের লেলিহান রিক্ততার রূপ। প্রয়াত কথাশিল্পী ও ছোটগল্পের আলোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই গল্পটিকে পৃথিবীর স্বল্পসংখ্যক সেরা ছোটগল্পের অন্যতম সেরা ছোটগল্প রূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর পক্ষপাতের কারণ অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়। তারাশঙ্করের প্রায় প্রতিটি গল্পেই লিপিচাতুর্য বা কথনের কৌশল অপেক্ষা ভাবাবেগের গাঢ়তা অনেক বেশী গণনীয় বিষয়। চমক সৃষ্টির বুদ্ধিগ্রাহ্য শিল্পরীতি অনুসরণে তাঁর আগ্রহ কম, গভীর ভাবের আবেদন

সৃষ্টি করে পাঠক মনকে আলোড়িত করে তোলাতেই তাঁর ছোটগল্পের সার্থকতা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুঃশাসনীয় ও ফেরিওলা দুটি গল্পেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন বাংলার সাধারণ দরিদ্র মানুষের চরম বস্ত্র-সংকটের রূপ প্রকটিত হয়েছে। দুটি গল্পেরই শেষে চমক আছে, কিন্তু সে বেদনার চমক। চূড়ান্ত রকমের ট্রাজিক বেদনার আঘাতে পাঠক চকিতে খাড়া হয়ে বসে দুটি গল্পেরই সমাপ্তিতে। প্রথম গল্পে গৃহবধূ আমিনার দেহ পুকুরের জলে ভেসে ওঠাতে কাহিনীর শেষ; দ্বিতীয় গল্পে নগ্নতার লজ্জা ঢাকবার জন্য কৃত্রিম আচ্ছাদনের আড়ালে আত্মগোপন করে গ্রামবধূদের ফেরিওয়ালার সঙ্গে দরকষাকষির মর্মন্তুদ দৃশ্য। এ যেন শরৎচন্দ্রের ভাষায় পথিকের করুণার উপর আত্মসমর্পণ করে পথিকের অনিচ্ছুক দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করার ব্যর্থ প্রয়াস। দেহের লজ্জা পাঠকের মনে কত বড় ট্রাজেডির বেদনা ঘনিয়ে তুলতে পারে তারই ব্যঞ্জনাময় সংকেত আছে গল্পটির পরিসমাপ্তিতে।

কোন কোন সমালোচকের বিচারে আবহপ্রধান গল্পই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের নিদর্শন। অর্থাৎ এঁদের মতে atmosphere তৈরির কুশলতাই উৎকৃষ্ট ছোটগল্পের প্রাণ। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' অথবা 'একরাত্রি', প্রমথ চৌধুরীর 'আহুতি', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনা-পোতা আবিষ্কার', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'রুদ্রের আবির্ভাব', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কালাবদর', সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্', প্রভৃতি। বহু ধূসর-বিধুর স্মৃতির পশ্চাৎটান বিজড়িত এককালের জমজমাট বর্তমানে পরিত্যক্ত বাদশাহী প্রাসাদের খাঁ খাঁ করা ভৌতিক রূপ (ক্ষুধিত পাষাণ); অন্ধকার নিশীথিনীতে উদ্বেল-উতরোল বন্যার জলের পটভূমিকায় এক জোড়া নরনারীর চকিত বিদ্যুদ্দীপ্তির আলোকে মুখোমুখি সন্দর্শনের ভাবাবেগঘন নাট্য-মুহূর্ত (একরাত্রি); ঝড়ের তাণ্ডবে উন্মথিত জমিদারী মহালের লণ্ডভণ্ড বিধ্বংসী রূপ (আহুতি); দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার একটি অজ-পাড়াগাঁয়ের নগর জীবনের প্রভাবলেশ বর্জিত আদিম

আরণ্যক রূপ (তেলেনাপোতা আবিষ্কার); ঝঞ্ঝার প্রমত্ততার মুখে পদ্মার সর্বনাশা রুদ্ররোষের মূর্তি (রুদ্রের আবির্ভাব); ফরিদপুর ও বরিশাল জিলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আড়িয়ল খাঁর কূলভাঙা স্রোতের কল্লোল (কালাবদর); প্রসবকালীন নারীর দেহযন্ত্রের জটিল জটের উন্মোচন দ্বারা পাঠক মনে রহস্যের বোধ জাগরিত করার শিল্পিত প্রয়াস (স্নুন্দরম্) ইত্যাদি।

বিদেশী সাহিত্যে এডগার আলেন পো-র একাধিক গল্পে উপরের ধরনের আবহপ্রধান উপাদান-উপকরণ দ্বারা কাহিনীর মূল বনিয়াদটি তৈরী করার নজীর আছে। অবশ্য পো-র গল্পের রস আরও অনেক বেশী ভয়াল-ভীষণ, আরও অনেক বেশী ভৌতিক রহস্যের আলোছায়াঘেরা। বাঙালী জীবনের শান্তমন্থর গতানুগতিক ছকের পিঠে পাশ্চাত্ত্যের অস্থির বিক্ষুব্ধ-সংঘাতময় জীবনের ছবি যে অনেক বেশী করাল ক্রূর হবে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

আবহাওয়া প্রধান গল্পে চরিত্রায়ণের রস অর্থাৎ মানবতার রস কম বলে ওই জাতীয় রচনায় ব্যক্তিগতভাবে আমার আকর্ষণ কম। প্রকৃতির বর্ণাঢ্য বর্ণনার উপযুক্ত ক্ষেত্র কাব্য, কথাসাহিত্য নয়। মানবজীবনের দুঃখ বেদনার গভীরতা পরিস্ফুটনের জন্য প্রকৃতিকে পৃষ্ঠপটরূপে ব্যবহার করবার অবশ্যই সার্থকতা আছে কিন্তু মানবজীবনকে আড়াল করে সেটাই যদি মুখ্য মনোযোগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আপত্তি জানাতেই হয়। সন্দেহ করবার কারণ আছে উল্লিখিত গল্পগুলির অনেক কটির কাহিনী-বৃত্তের মধ্যে এমনতর ব্যাপারই ঘটেছে—মানবীয় রস পিছনে চলে গিয়ে আবহের রসকে সম্মুখে জায়গা করে দিয়েছে। ক্ষুধিত পাষাণ উচ্চাঙ্গের কাব্যসৃষ্টির নমুনা হতে পারে কিন্তু উচ্চাঙ্গের ছোটগল্প নয়। বরং সেই তুলনায় এক রাত্রি গল্পের নাটকীয়তা অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক।

একেবারে হাল আমলের শক্তিশালী ছোটগল্পকারদের কথা আপাতত আমার আলোচনার বৃত্তের মধ্যে আমি আনতে চাইছি না—নতুন

প্রজন্মের ছোটগল্প লেখকদের গুণ বিচারের জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রয়োজন—তবে এখানে বাংলা ছোটগল্পের সমৃদ্ধ বিগত ঐতিহ্যের উপর এক নজর চোখ বুলনো যেতে পারে। কথাটা ব্যবহারে ব্যবহারে বহু বিমর্দিত হলেও পুনরুক্তির ঝুঁকি নিয়েই বলা প্রয়োজন যে, বাংলা ছোটগল্পের ভাণ্ডারে এমন সব উৎকৃষ্ট ছোটগল্প আছে বিশ্বসাহিত্যের সেরা ছোটগল্পগুলির সঙ্গে যেগুলি অনায়াসে তুলনীয় হতে পারে। বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগটি নিয়ে আমরা সঙ্গতভাবেই গর্ব করতে পারি। তবে গৌরববোধের হালে ভর দিয়ে নিশ্চেষ্ট বসে থাকলে চলবে না, গৌরবের পুঁজিকে আরও বাড়াবার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। উঠতি কালের ছোটগল্পকারদের এই দিক দিয়ে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। তাঁরা সে বিষয়ে সচেতন আছেন বলেই বিশ্বাস করি।

পুরাতন ও সদ্যোবিগত যুগ মিলিয়ে বাংলায় নামী ছোটগল্পকারের সংখ্যা অগণন। পুরাতনকালীনদের মধ্যে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বাংলা ছোটগল্পকার হলেন—রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, ত্রৈলোক্যনাথ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মনীন্দ্রলাল বসু, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, সুধীরকুমার চৌধুরী, নারায়ণ ভট্টাচার্য, মানিক ভট্টাচার্য, জলধর সেন, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। প্রবাসী, সবুজপত্র, ভারতবর্ষ, ভারতী পত্রিকার কাল পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্পের সর্বস্বীকৃত প্রতিনিধিদের নামের এই হিসাব। কল্লোল-কালিকলম-পূর্বাশা-উপাসনা-বঙ্গশ্রী-শনিবারের চিঠি প্রভৃতি পত্রিকার পর্বে আবার আরেক প্রজন্মের লেখক গোষ্ঠীর আবির্ভাব। এই কালের স্বীকৃত ছোটগল্পলেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট হলেন—জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্যকুমার, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ-বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু, মনোজ, বনফুল, প্রবোধ, মানিক, বুদ্ধদেব, অন্নদাশঙ্কর, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র মিত্র, বিমল মিত্র, নবেন্দু ঘোষ,

সুশীল জানা, গজেন্দ্র মিত্র, সতীনাথ ভাদুড়ী, আশাপূর্ণা দেবী, বাণী রায় প্রভৃতি।

এই দীর্ঘ সারিবদ্ধ মিছিলের মধ্যে সবসেরা ছোটগল্পকারের মুখটি যদি চিনে বার করতে হয় তবে নিঃসন্দেহে অধিকাংশেরই পক্ষপাত পড়বে একটি নামের উপর। তিনি অদ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ। আমার নিজের পক্ষপাতও এই নামের প্রতি অসন্দিগ্ধ ও অকম্পিত। আজও ছোটগল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথের মাথা কেউ ছাড়াতে পারেননি বলে আমার স্থির বিশ্বাস। মানবীয় রস, লিপিনৈপুণ্য, চরিত্রায়ণ, পূর্বোক্ত চমক সৃষ্টির কৌশল এবং আবহরচনার দক্ষতা—যে দিক দিয়েই বিচার করা যাক না কেন রবীন্দ্রনাথ আজও বাংলা ছোটগল্পে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছেন। সর্বোপরি তাঁতে আছে অনাবিল হাস্যরস, যা অনেকেরই লেখায় পাওয়া যাবে না—ত্রৈলোক্যনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু এই রকম কয়েক জনকে বাদ দিলে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের হিউমার তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবার মত বস্তু, এর কোন দোসর নেই বাংলা সাহিত্যে। রবীন্দ্র-ছোটগল্প, ছোটগল্প তো নয়, এক একটি হীরের টুকরো।

অবশ্য এ ব্যাপারে ভিন্নমত যে আদৌ নেই এমন নয়। যেমন, কোন কোন সমালোচকের ধারণা, আবেগের প্রবলতা সৃষ্টি করে পাঠক হৃদয়কে আলোড়িত করবার ক্ষেত্রে ছোটগল্পে তারাশঙ্করের স্থান রবীন্দ্রনাথের উপরে। ভিন্ন একটি মত শরৎচন্দ্রকে এই কৌলীন্য দানের পক্ষপাতী। যদিও শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের সংখ্যা মুষ্টিমেয় বললেও চলে। চতুর্থ একটি অভিমত, অন্তর্ভেদী বাস্তবতার আলো-আঁধারি ঘেরা সমাজচিত্র উপস্থাপনার ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জুড়ি কেউ নেই। শুধু তাই নয়, ছোটগল্প নির্মাণের বিশুদ্ধ শিল্পদক্ষতার নিরিখেও তিনি অনন্য।

এসব বিবিধ মতের বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে বাদানুবাদ চলতেই থাকবে। কিন্তু মতামত যাই হোক, গল্প সুলিখিত হলে তার রস উপভোগে তো কোন বাধা নেই—তা সে যে গোত্রেরই গল্প হোক না কেন এবং

যাঁরই হাতে তার সৃষ্টি হোক না কেন। একই পাঠকের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের গল্প উপভোগ করা সম্ভব, কখনও কখনও এককালীনও এ জিনিস ঘটতে দেখা যায়। এমন কি সম্পূর্ণ বিপরীত স্বাদের গল্প হলেও আটকায় না। এ ব্যাপারে পাঠকের গ্রহণ-ক্ষমতা অসাধারণ, তাঁর বৈচিত্র্যের ক্ষুধাই তাঁকে রস থেকে রসান্তরে সঞ্চরণ করে ফেরায়। এক বিষয়বস্তু থেকে আরেক বিষয়বস্তুতে অবলীলায় যাওয়ার স্বাচ্ছন্দ্য পাঠকের অপার গ্রহিষ্ণুতার প্রমাণ।

এবারে বাংলা ছোটগল্পের একটি অপূর্ণতার দিক নিয়ে আলোচনা করব। গত কমবেশি একশো বছর কালের মধ্যে আমরা বাংলা ছোটগল্পের বহুতর বৈচিত্র্য লক্ষ করেছি—বিষয়-বৈচিত্র্য এবং লিপি বৈচিত্র্য দুই দিকেই তার রকমারিত্বের তুলনা নেই। কিন্তু টলস্টয়ের ধরনে বাইবেলীয় প্যারাব্‌লের আঙ্গিকে কিংবা অনুরূপ সংক্ষেপ প্রয়াসী কোন রচনাশৈলীর অবলম্বনে বাংলার বয়স্ক সাহিত্যের আঙিনায় নীতিমূলক কোন ছোটগল্প লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অর্থাৎ টলস্টয়ের 'টুয়েন্টি-থ্রি টেলস'-এর গল্পগুলি যে জাতের, তার সদৃশ কিংবা তার কাছাকাছি প্রকৃতির গল্প বাংলা ভাষায় আজও অবধি রচিত হয়েছে কি বয়স্কপাঠ্য কথাসাহিত্যের সংসারে? আমার মনে হয় এক্ষেত্রে আমাদের দৈন্য অতিশয় সুপ্রকট।

অবশ্য টলস্টয় এ বইতে নীতিভিত্তিক যে সমস্ত গল্প লিখেছেন—যেমন, 'ঈশ্বর সত্যদ্রষ্টা কিন্তু অপেক্ষমাণ', 'মানুষ কাকে অবলম্বন করে বাঁচে?', 'বোকা আইভান', 'ক্ষুদে শয়তান এবং রুটির খোসা', 'বাঁচবার জন্য মানুষের কতটা জমি দরকার?' প্রভৃতি—তার প্রত্যেকটিই আয়তনে বড় তবে বাইবেলীয় নীতিগল্পের ধরনে তার কেন্দ্রীয় বক্তব্য একটাই এবং বক্তব্যটি নীতিঘটিত। যেমন গল্পগুলির মধ্য দিয়ে মানব প্রেম ও মানব সেবার মাহাত্ম্য, রণলিপ্সার অনিষ্টকারিতা, অতিরিক্ত মুনাফাপরায়ণতার নিন্দা, পানাভ্যাসের বিরোধিতা, যুদ্ধবিরোধী মনোভাব, জমির লোভের সমালোচনা প্রভৃতি বিবিধ বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে

নীতির আবরণে। এ রকম গল্পের নজির কি বাংলায় আছে? আমার তো জানা নেই।

কেউ কেউ বলতে পারেন পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, ঈশপের গল্প, ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত রূপকথা উপকথা ইত্যাদির ভিত্তিতে বাংলা শিশুসাহিত্যে অনেক গল্প লেখা হয়েছে এ যাবৎ। উপেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, সুখলতা রাও, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ অনেকেরই লেখাতে এই জাতীয় গল্পের নমুনা পাওয়া যাবে। কিন্তু টলস্টয় যেভাবে এই জাতীয় গল্পকে সার্বভৌম শিল্পের (ইউনিভার্সাল আর্ট) নিদর্শন হিসাবে বয়স্ক সাহিত্যের আসরে উপস্থিত করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সে-চেষ্টায় সফলও হয়েছিলেন—তেমন প্রয়াসের উদাহরণ বাংলায় নেই বলেই আমার ধারণা। টলস্টয় এই শ্রেণীর গল্পকে কতখানি গুরুত্ব দিতেন তাঁর প্রসিদ্ধ শিল্পবিষয়ক বই 'হোয়াট ইজ আর্ট?' বইয়ের নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদ থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। টলস্টয় লিখছেন—

"ভবিষ্যতের শিল্পী নিশ্চয়ই এটা উপলব্ধি করবেন যে, রূপকথা ও চিত্তস্পর্শী গান রচনা করা, মনোহারী কোন ঘুমপাড়ানি ছড়া বা ধাঁধা বানানো, কৌতুকপ্রদ শ্লেষ বা ব্যঙ্গ উদ্ভাবন করা, অথবা বেশ কয়েক প্রজন্মে বিস্তৃত লক্ষ লক্ষ শিশু ও পূর্ণবয়স্ক পাঠকের মনোরঞ্জনকারী কোন গল্প বা নকশা তৈরি করতে পারা—এ সব কাজ একটি উপন্যাস বা সিম্ফোনি রচনা করার চেয়ে কিংবা একটি ছবি আঁকার চেয়ে নিঃসন্দেহে অনেকগুণ বেশী দরকারী ও সমধিক ফলদায়ক। উপন্যাস বা সিম্ফোনি-সঙ্গীত কিংবা চিত্রাঙ্কন দ্বারা ধনী শ্রেণীর একাংশের চিত্তবিনোদন করা যায়, তা-ও কিয়ৎকালের জন্য মাত্র কিন্তু পরমুহূর্তেই সে সবের প্রভাব চিরকালের জন্য মুছে যায়। সর্বসাধারণের অধিগম্য সহজতম আবেগ-অনুভূতির এই যে শিল্প, এর এলাকা সুবিশাল এবং এই এলাকাটি এখনও পর্যন্ত প্রায় অনাবিষ্কৃত রয়েছে।"

টলস্টয় যে ফেবল, প্যারাব্‌ল, রূপকথা উপকথা লোককথা জাতীয়

গল্পকে জাতীয় শিক্ষা ও আনন্দ প্রচারের ক্ষেত্রে কী অপ...চ্ছি, আর দিতেন টুয়েন্টি-থ্রি টেলস-এর গল্পগুলি পড়লে তার একটা সঠিক ভগ্নাংশও পাওয়া যেতে পারে। এই গল্পগুলির প্রশংসা শুধু নীতিবা... ভরসা করেননি ; বার্নার্ড শ', এইচ. জি. ওয়েলস, ডি. এইচ. লরেন্স ও পাশ্চাত্ত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকরাও গল্পগুলির অকুণ্ঠ প্রশংসায় মুখর হয়েছেন... বস্তুতঃ ডি. এইচ লরেন্স টলস্টয়কে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকারের সম্মান দিয়েছেন। নীতি তো একটা আবরণ মাত্র, গল্পগুলি তাদের গল্পত্বের জন্যই চির-আদৃত হওয়ার যোগ্য।

☐ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্য : একটি সমীক্ষা ☐

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে [১৯৪৭ সালে লিখিত]। এই পঁচিশ বছর কালসীমার মধ্যে অন্যান্য বিভাগের কর্মতৎপরতার মত বাংলা সাহিত্যেরও পঁচিশ বছর পূর্ণ হলো। পঁচিশ বছর সময় নিতান্ত কম সময় নয়। একটা সাহিত্যের গতি প্রকৃতি প্রবণতা বোঝবার পক্ষে সময়টাকে কোনমতেই অযথেষ্ট মনে করা যায় না। সাহিত্য এগোচ্ছে কি পেছোচ্ছে, তার চলার ভঙ্গীর মধ্যে প্রগতির বেগ দৃশ্য কি দৃশ্য নয়, সাহিত্যের সুরের ভিতর বিদ্রোহ বা বিপ্লবের আদৌ কোন কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে কিনা—এ সব লক্ষণ যদি আমরা পঁচিশ বছরেও অনুভব করতে না পারি তাহলে কোন সময়েই অনুভব করতে পারব না।

এই মানদণ্ডের নিরিখে বিচার করে গত পঁচিশ বছরের বাংলা সাহিত্যের একটা সমীক্ষা করলে মন্দ হয় না, আর সেই সমীক্ষণের উদ্দেশ্যে আজকের এই প্রবন্ধের অবতারণা।

গোড়াতেই বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, আমার এই সমীক্ষায় পাঠককে খুশী করার মত কথা খুব বেশী আমি বলতে পারব না; আমার অনুভব বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত বরং আমাকে বিপরীত ভূমিকার দিকেই সুনিশ্চিতভাবে ঠেলে দিতে চাইবে। স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীর বৎসরে চারদিককার উৎসব-সমারোহের মধ্যে আমার এই মন-না-রাখা কথা কারও কারও কাছে বেসুরো ঠেকতে পারে। কিন্তু আমি নিরুপায়। সত্যকে বলি দিয়ে লোকমনোরঞ্জনের বিদ্যা আমার আয়ত্তে নেই।

'স্বাধীনতা' কথাটার নানাবিধ অর্থ হতে পারে। সংকুচিত অর্থে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ব্যাপকতর অর্থে রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক-সামাজিক স্বাধীনতা। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট প্রথমটি আমাদের করতলগত হয়েছে। দ্বিতীয় বর্গের স্বাধীনতা করতল-

গত হতে এখনও ঢের বিলম্ব। দেশের হালচাল যা দেখতে পাচ্ছি, আর রাজ্যশাসনের নমুনা, তাতে অর্থনৈতিক-সামাজিক স্বাধীনতার ভগ্নাংশও আমাদের জীবদ্দশায় বাস্তবে সার্থকায়িত দেখে যেতে পারব বলে ভরসা হয় না।

কিন্তু স্বাধীনতার একটি তৃতীয় আয়তনও আছে। সেই আয়তন সাংস্কৃতিক। আর এইখানেও আমাদের নিরাশ হতে হয়েছে মর্মান্তিক ভাবে। আশা করা গিয়েছিল যে, ভারতবাসী যখন তার প্রার্থিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে তখন জাতির অন্তরে যে সৃষ্টিশীলতার স্পৃহা, প্রাণের চাঞ্চল্য এতকাল নানা কারণে প্রসুপ্ত অবস্থায় ছিল, বাঁধভাঙা বন্যার মত এবার তার দিকে দিকে বিস্ফার ঘটবে—ঘুমন্ত জাতি জেগে উঠবে অদম্য সৃষ্টির উন্মাদনায়। আর যেহেতু শিল্প-সাহিত্য হলো সৃষ্টিশীলতার একটি বড় ক্ষেত্র, সেই কারণে ওই দুর্বার প্রাণশক্তির অভিব্যক্তির একটি প্রধান বাহন হবে শিল্প-সাহিত্য।

কিন্তু কার্যতঃ আমরা কী দেখলাম? দেখলাম দুটি বিপরীত প্রবৃত্তির অদ্ভুত সহাবস্থান—তাতে প্রকৃত সৃষ্টিশীলতার আবেগ খুব কমই চোখে পড়লো। এই দুই বিপরীত প্রবৃত্তি হলো—উচ্ছৃঙ্খলতা ও অরাজকতা একদিকে; স্থিতাবস্থার দিকে মানিয়ে চলবার ঝোঁক অন্যদিকে। সাহিত্য তো জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি আলাদা ক্ষেত্র নয়। সাহিত্য জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কাজেই জীবনে যা ঘটে সমাজে যা ঘটে, সাহিত্যেও তার প্রতিফলন অবধারিত। গত পঁচিশ বছরে বাঙালী সমাজে আমরা যে দুটি প্রবণতার কিম্ভূত পাশাপাশি অবস্থান লক্ষ করছি তারই হুবহু ছায়া পড়েছে বাংলা সাহিত্যের গায়ে। অর্থাৎ একদিকে উচ্ছৃঙ্খলতা ও চিন্তার নৈরাজ্য; অন্যদিকে কায়েমী স্বার্থের ধারক-বাহকদের সঙ্গে কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষি করে চলবার প্রবৃত্তি। উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৈরাজ্যের প্রমাণ পাচ্ছি লেখকদের একাংশের অনিয়ন্ত্রিত দেহবাদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত পক্ষপাতের ভিতর; কায়েমী স্বার্থের পোষকতার প্রমাণ পাচ্ছি শাসকশ্রেণী তথা সর্বপ্রকার 'এস্টাব্লিশমেন্ট'-এর প্রতি-

নিধিদের সঙ্গে লেখকদের দহরম-মহরমের অভ্যাসের মধ্যে। সমাজতন্ত্র এ যুগের একটি শ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং শুনতে পাই এই চিন্তাদর্শ নাকি আমাদের সরকারের ঘোষিত লক্ষ্যাদির অন্যতম। কিন্তু কোথায় তার অভিব্যক্তি আমাদের বাংলা সাহিত্যের ভূরিপরিমাণ রচনার মধ্যে? আমাদের লেখকেরা গত পঁচিশ বছরে দুটি জিনিস আয়ত্ত করেছেন বিধিমতে—এক, সমাজবিরোধী অবক্ষয়ী অশ্লীল সাহিত্য রচনা করে পাঠকসমাজের সুস্থ প্রবৃত্তিকে বিপথে চালিত করা ; দুই, সমাজে ও রাষ্ট্রে যাঁরা শক্তিমান ; পুরস্কার, অনুগ্রহ ও অন্যবিধ সুবিধা বিতরণের ক্ষমতা যাঁদের মুঠোয় ; তাঁদের না ঘাঁটিয়ে, এবং সম্ভবপর স্থলে খুশী করে, কেমন করে সাহিত্য রচনা করা যায় তার কৌশল অধিগত করা। দুটি বিদ্যাতেই একালীন লেখকেরা এমন রপ্ত যে এ বাদে সাহিত্যের আর যে কিছু করণীয় আছে তা এঁদের ভাবসাব দেখলে মনেই হয় না।

অবশ্য একথার ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। সব সমাজেই কিছু শ্রদ্ধেয় ব্যতিক্রম সব সময়েই থাকে, কিন্তু মুশকিল এই যে, তাঁদের কথা লোক-সমাজে তেমন প্রচারিত হয় না। প্রচারের যে সব সুবিদিত মাধ্যম আছে—যেমন সংবাদপত্র, রেডিও ইত্যাদি—তাঁরা সব স্থিতাবস্থার পোষক লেখকদের ডঙ্কা পিটোতেই ব্যস্ত, স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অনুগামী সাহিত্যিকদের প্রতি ঔদাসীন্য দেখানোটা তাঁদের অভ্যস্ত ভূমিকার অন্তর্গত কাজ। (এস্থলে স্বাধীন ভারতের সংবাদপত্রের আদর্শভ্রষ্টতার বিষয়ে অনেক কথা বলা যেতে পারত, কিন্তু যেহেতু সেটা প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়, সেই কারণে ওই প্রসঙ্গের ইঙ্গিত-মাত্র করেই এখানে ক্ষান্ত হওয়া গেল।) এ সমাজে স্বাধীনচিত্ত লেখকদের প্রভূত বাধাবিপত্তি আর প্রতিকূলতা সহ্য করেও আপন আদর্শে স্থিত-প্রযত্ন থাকতে পারার সন্তোষ ছাড়া আর কোন সন্তোষই মেলে না, সামাজিক স্বীকৃতি কিংবা লোকপ্রিয়তা তো অনেক পরের কথা। অথচ খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, এই শেষোক্ত শ্রেণীর লেখকদের মধ্যেই যথার্থ সৃষ্টিশীলতার লক্ষণ বিদ্যমান—তাঁরাই বলতে গেলে সমাজতন্ত্রের

আলোক-বর্তিকাটিকে নানা ঝড়ঝাপ্টার আঘাত থেকে বাঁচিয়ে প্রদীপ্ত অবস্থায় এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সম্মুখপথে। প্রগতিশীল চিন্তা ও কল্পনার সত্যিকারের প্রতিনিধি এঁরাই ; লোকপ্রিয়তার ভজনাকারী, স্থিতাবস্থার উপাসক, হাটের কারবারী লেখককুলের ভিতর ওই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করতে গেলে বিফলমনোরথ হতে হবে।

কেউ কেউ বলেন, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরেকার এই গোড়াকার দিকের বৎসরগুলি হলো গঠনমূলকতার কাল : একান্তভাবে রচনাত্মক অভ্যাসের দিকেই আমাদের এই কালে মন দিতে হবে। এখন কিছুকাল আন্দোলন আলোড়ন সংগ্রাম বিদ্রোহ বিপ্লব ইত্যাদি প্রত্যক্ষ সংঘাতমূলক কাজ স্থগিত থাকুক। কি রাষ্ট্রে কি সমাজে কি অন্যতর ক্ষেত্রে। সাহিত্যেও এটা গঠনমূলকতার কাল। কাজেই এখন বিদ্রোহ বা বিপ্লবের বাণী নয়, এখন সব দিক বাঁচিয়ে নির্বিরোধ সাহিত্যসৃষ্টির সময়।

বলা বাহুল্য, গঠনমূলক কথাটার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা থেকে এই মনোভাবের উদ্ভব। গঠনমূলক ভাবনা বা কাজ রচনাত্মক হলেও তা স্থিতাবস্থা বজায় রেখে চলার সাধনা নয়। সাহিত্যের অনুষঙ্গে বিষয়টির বিচার করলে দেখা যায়, আমাদের সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে তাঁরাই সবচেয়ে গঠনমূলক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন যাঁরা গতানুগতিক ধারণা-ভাবনা খুব শক্ত হাতে ভেঙেছেন, ভেঙে সাহিত্যের স্রোতকে নতুন খাতে বইয়েছেন। এ কথার প্রমাণ মাইকেল বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র, মায় কল্লোল যুগের লেখকবর্গ পর্যন্ত। ভাঙতে না জানলে গড়তে পারা যায় না। মাইকেল মধুসূদন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক অমিতশক্তিধর কবি। তিনি কী করেছিলেন? তিনি দু'হাতে বাংলা কাব্যের প্রচলিত সংস্কার ভেঙেছিলেন —অমিত্রাক্ষর প্রবর্তনার দ্বারা পয়ারের বন্ধনমুক্তি ঘটিয়েছিলেন, সনাতন রাম-রাবণের ভূমিকার রদ-বদল ঘটিয়ে প্রচলিত বীরপূজার ধারণায় প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন, বাংলা কবিতায় সনেটের সংযোজনা করেছিলেন, নাট্যক্ষেত্রে প্রহসন এনেছিলেন, ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্র বলতে গেলে বাংলা গদ্যকেই নতুন করে সৃষ্টি করলেন তাঁর

অনবদ্য উপন্যাস সমূহের রচনারীতির মাধ্যমে। আরও একাধিক ক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রচণ্ড শক্তিমত্তার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। যেমন, প্রখর মনস্বিতার সহায়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের হিতার্থে একটি নতুন সাহিত্যাদর্শেরই জন্ম দিলেন, যে-সাহিত্যাদর্শের মূলকথা হলো সাহিত্য সমাজকল্যাণমূলক হওয়া চাই, নিছক বিশুদ্ধ সাহিত্যের চর্চা অবিধেয়। দীনবন্ধু মিত্র বাংলা নাট্যসাহিত্যে বাস্তবতার রূপকার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ বাংলা সাহিত্যে বলতে গেলে একটা এযাবৎ অপরিজ্ঞাত নতুন মূল্যবোধ সংযোজন করলো—অন্যায়-অসহিষ্ণুতা। রবীন্দ্রনাথের সাধনার অভিনবত্ব সম্বন্ধে বিশদ করে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রথম জীবনের সাহিত্যানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ কিছু পরিমাণে প্রচলিত ধারণা-ভাবনার দ্বারা চালিত হয়েছিলেন, সংস্কারের হাতে-ধরা হয়ে তিনি তাঁর চিন্তা-জীবনের সূত্রপাত করেছিলেন ; কিন্তু যতই তাঁর বয়স হতে লাগল ততই দেখা গেল তিনি তাঁর ভাবনা-ধারণাকে উত্তরোত্তর প্রগতিশীল প্রত্যয়ের দ্বারা উজ্জীবিত করে তুলেছেন, এমনকি এ-কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, শেষ বয়সে তিনি সমাজতন্ত্রী প্রত্যয়ের খুবই কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আরও কিছুকাল বেঁচে থাকলে হয়ত সমাজতন্ত্রকে জীবনের মূল অবলম্বন রূপে গ্রহণ করতেন।

এদিকে অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য এখানে যে, তিনি তাঁর উপন্যাসে-গল্পে চিত্র ও চরিত্রের মুখগুলিকে নীচুতলার দিকে চালিত করেছিলেন। এযাবৎ বাংলা সাহিত্যে চিত্র-চরিত্রের উপস্থাপনায় অভিজাত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজেরই প্রাধান্য ছিল, শরৎচন্দ্রই প্রথম সার্থকভাবে তার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন অবজ্ঞাত শ্রেণীগুলির দিকে। শরৎচন্দ্রের এই প্রক্রিয়াটাকেই পরে কল্লোলের ও তৎপরবর্তী কালের লেখকেরা আরও অনেক দূর সম্প্রসারিত করেছিলেন। কাজী নজরুল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখের কবিতায় ; জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র,

অচিন্ত্যকুমার, মনোজ, তারাশঙ্কর, বিভূতি, মানিক প্রমুখের গল্পে-উপন্যাসে অবহেলিত শ্রেণীর মানুষেরা সাহিত্যের পাতায় কথা কয়ে উঠলো।

এসব গত কথা বিশদ করে বলবার দরকার ছিল না কিন্তু দরকার হয়েছে সাহিত্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর, বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গীর গঠনমূলক ভূমিকাকে চিহ্নিত করবার জন্যে।

এঁরাই বাংলা সাহিত্যের সত্যিকারের গঠনমূলক লেখক। ভাঙার প্রেরণা এঁদের মধ্যে ছিল বলেই গঠনের প্রেরণাও তাঁরাই দিয়েছেন। যে সব লেখক প্রচলিত মূল্যবোধের উপর অভ্যাসমসৃণ ভঙ্গীতে কেবলমাত্র দাগা বুলোতেই জানেন, কিছুকে এবং কাউকেই ঘাঁটাতে সাহস করেন না, তাঁরা না ভাঙতে জানেন, না গড়তে জানেন। বিগত পঁচিশ বছরের বাংলা সাহিত্যে এইসব গতানুগতিধর্মী লেখকেরাই মূলতঃ আসর জাঁকিয়ে রেখেছেন—বেশির ভাগই হেজিপেঁজি লেখক, শুধু প্রচারসুবাদে নতুন প্রজন্মের পাঠক-সম্প্রদায়ের উপর দিয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে চলেছেন।

কেউ কেউ বলতে পারেন, আমি যেসব লেখকের নাম করেছি তাঁদের দু-চার জন তো আজও বেঁচে আছেন কিংবা এই সেদিন পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন ; স্বাধীনতার পরেই কি তাঁদের লেখনী হঠাৎ গতানুগতিস্পৃষ্ট হয়ে উঠল ? ঠিক তা নয়, তবে স্বাধীনতার পরে তাঁদের রচনার ধারাধরনের যে বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি বরং অবনতি হয়েছে সে-কথা অতি স্পষ্ট। দৃষ্টান্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র। কী উজ্জ্বল প্রত্যাশা তিনি জাগিয়ে ছিলেন তাঁর অনবদ্য ছোটগল্প ও কবিতার মাধ্যমে, কল্লোল-কালিকলম পত্রিকায় লেখনী সঞ্চালন করবার কালে! আর এখন? এখন মাঝে মধ্যে দু-চারটি ভাল কবিতা লিখলেও তাঁর তাবৎ সাহিত্য বলতে গেলে এসে ঠেকেছে গোয়েন্দা-গল্প লেখার মধ্যে আর 'ঘনাদা' সিরিজে। এই কি প্রেমেন্দ্রের উপযুক্ত ভূমিকা ? তারাশঙ্করের অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য গল্প-উপন্যাস স্বাধীনতা-পূর্ব অধ্যায়ে রচিত। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে তিনি উল্লেখযোগ্য কিছুই লেখেননি এমন কথা বললে ঢালাও মন্তব্য করার দায়ে পড়তে হবে, তবে এ কথা আশা করি প্রতিবাদের শঙ্কা না করেই

বলা যায়, স্বাধীনতার পরে তাঁর রচনায় সৃষ্টিধর্মিতার আবেগ ফুরিয়ে গিয়েছিল। এই পর্বে যা-কিছু তিনি লিখেছেন তার বেশির ভাগই লিখেছেন অভ্যাসবশে, যন্ত্র চালিতের মত।

কেন এমনটা হলো? এ ব্যাপারে আমার একটা নিজস্ব ধারণা আছে। সেটা স্বীকার করা না করা পাঠকের অভিরুচি। ধারণাটি হলো: স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তারাশঙ্কর ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে বড্ডবেশী মাখামাখি শুরু করে দিয়েছিলেন। যে নিরাসক্ত detached দৃষ্টি শিল্প-সাধনার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, সেই নিরপেক্ষ দৃষ্টি আর তাঁর ছিল না। ক্ষমতাবানদের সঙ্গে প্রয়োজনাতিরিক্ত অন্তরঙ্গতার চর্চায় তাঁর ভিতর যেটুকু বা বিদ্রোহের তেজ ছিল তা মরে গিয়েছিল। এবং অবধারিত ভাবেই তার ছাপ গিয়ে পড়েছিল তাঁর লেখার উপরে। তারাশঙ্কর অবশ্য কোন কালেই পুরাপুরি অর্থে বিদ্রোহী লেখক ছিলেন না, তিনি ছিলেন দরদী লেখক—সমাজের নীচু তলার অনাদৃত শোষিত নিপীড়িত মানুষদের জন্যে তাঁর অন্তরে ছিল অপরিমেয় সহানুভূতি। স্বাধীনতার পরবর্তী পর্বে সেই সহানুভূতির প্রকাশে যান্ত্রিকতার ছোঁয়া লেগেছিল। সত্যি কথা বলতে, স্বাধীনতার পরে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' আর 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' ছাড়া আর কোন মনে রাখবার মত বই তিনি লিখেছেন বলে স্মরণ করতে পারছি না। 'আরোগ্য নিকেতন'? ওটি আসলে তথাকথিত সনাতন ভারতীয় আদর্শের অনুকূলে সূক্ষ্ম প্রচারকার্য—ওর মধ্যে আর্টের সৌন্দর্য বিশেষ কিছু নেই।

এ তো গেল তারাশঙ্কর। শৈলজানন্দ তো একেবারেই ফুরিয়ে গেছেন বলে মনে হয়। যিনি একদা 'ধ্বংসপত্রের যাত্রী এরা', 'অতি ঘরন্তী না পায় ঘর'-এর মত অবিস্মরণীয় গল্প বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের উপহার দিয়েছেন, তিনি এখন তাঁর বাল্যবন্ধু কাজী নজরুল ইসলামকে অবলম্বন করে পরের পর স্মৃতিকথা লিখে চলেছেন। একই বিষয়ের উপর অন্তহীনভাবে দাগা বুলিয়ে বিষয়টিকে নিমতিতো করে ছাড়ছেন। এটা কি শুধু বয়সের জন্যই ঘটছে? ঠিক তা নয়, সাহিত্যের

প্রবহমান পরিবেশের স্থূলতাও এজন্যে কম দায়ী নয়। এখনকার প্রত্যাশার মানটাই এত নীচু সুরে বাঁধা যে, ক্ষমতাপন্ন বর্ষীয়ান্ লেখকেরা তাঁদের শক্তির মাপের আনুপাতিক সাহিত্যসৃষ্টির তাগিদ অনুভব করেন না কখনও, সাহিত্যকে খেলনা-খেলার আসর মনে করে যা-হোক তা-হোক লিখে পাঠকের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা করেন। যেমন শৈলজানন্দের হাল হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ধর্মভিত্তিক 'পরমপুরুষ' সিরিজের ফাঁদে পড়ে প্রত্যুত সাহিত্যসৃষ্টি থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন অনেকদিন—তাঁর আর সংশোধনের আশা নেই। জীবনের সংগ্রাম, দারিদ্র্য-দুঃখ, বঞ্চনা, শোষণ, বেদনা, দর্পীর দম্ভ আর বলীর অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে সংগত ক্ষোভ—এসব বর্ণনীয় বিষয় নয়; বর্ণনীয় বিষয় হলো শুধু ধর্মের মোহকর নেশা। প্রগতির ঝোঁককে পিছন দিকে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা আর কাকে বলে! এর চেয়ে কল্লোলের সময়কার উদ্দাম-দুর্দম অচিন্ত্যকুমার—যিনি 'বেদে' লিখেছিলেন, লিখেছিলেন 'অমাবস্যা' কাব্য—সে অনেক ভাল ছিল! সাহিত্যের একটি মূল সুরই হলো বিদ্রোহ, পূর্বেই বলেছি। অন্যায়, প্রচলিত অসম অবস্থা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ অগ্রসরভাবাপন্ন সাহিত্যের একটি প্রধান উপজীব্য। এই মাপকাঠিতে বিচার করলে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্য যে অনেকটা জুড়িয়ে গেছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ করা চলে না।

তবে কি গত পঁচিশ বছরে সার্থক রচনা একেবারেই কিছু লেখা হয়নি? তা কেন হবে? সাহিত্যের ইতিহাসের এমন কি কোন কালিক সূত্র আছে যে এই পর্ব পর্যন্ত সাহিত্যরচনার সার্থকতার কাল, আর তার পরের পর্বে ক্রমেই সাহিত্যের বন্ধ্যাত্বের দশা? চলমান সাহিত্যের বেলায় এরকম কখনও হয় না। যে-কোনো পর্বে বা অধ্যায়েই ভাল-মন্দ রচনা দুই-ই জড়িয়ে-মিশিয়ে থাকে, তবে তাদের পরিমাণের কম-বেশি দিয়ে একটা অধ্যায়ের গতি-প্রকৃতি প্রবণতা স্থিরীকৃত হয়ে থাকে। স্বাধীনতা-উত্তর গত পঁচিশ বছরের বাংলা সাহিত্যের মূল লক্ষণটা গতানুগতিক; প্রকৃত সৃষ্টিধর্মিতার তথা বলিষ্ঠ মনোভঙ্গীর অভাব

গোটা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রটাকে একটা ঊষর মরুভূমিতে পরিণত করেছে বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না, যে-মরুভূমির মাটিতে ফুলগাছ জন্মায় না কিন্তু কাঁটাগাছ ফুঁড়ে ওঠে অগুণ্‌তি আপনা থেকেই। তবে সান্ত্বনা এই যে, এই ব্যাপক বিস্তৃত ঊষর মরুর মধ্যেই দৈব অনুগ্রহের মত কোথাও কোথাও আচমকা মরূদ্যানের দেখা মিলে যায় আর সেই মরূদ্যানগুলিই পথিকের ক্লান্তির আরাম, তৃষ্ণার শান্তি, ক্ষুধার খাদ্য।

তেমনি মরূদ্যানের আশ্বাস বয়ে আনে মানিকের গল্প-উপন্যাস, তাঁর ধারাবাহীদের সমাজ-বাস্তবতার কথাসাহিত্য। নতুন কবিদের কিছু ভাল কবিতা, আর নাটকে কিছু অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচেষ্টা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাধীনতার পরে বছর দশেক বেঁচেছিলেন, এই দশ বছরে কিছু সার্থক ছোটগল্প ও উপন্যাস তিনি রচনা করে গিয়েছিলেন, যে রচনাগুলিতে তাঁর সমাজ-চৈতন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ, শোষক ও অত্যাচারী শ্রেণীর উপর নির্মম অভিসম্পাত, নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষদের দারিদ্র্যের দুঃখে নিবিড় বেদনাবোধ অপূর্ব শিল্প-অভিব্যক্তি লাভ করেছে। মানিক ছিলেন বাংলা সহিত্যের সবচেয়ে সৎ ও চরিত্রবান লেখক। জীবন দিয়ে তিনি সাহিত্য রচনা করে গিয়েছিলেন, বৈষয়িক সুবিধার লাভে তিনি কখনও ক্ষমতাবানদের ভজনা করতে যাননি বা স্বীয় বিশ্বাসের সঙ্গে আপস করেননি। রাজনৈতিক দর-কষাকষির মধ্য দিয়ে পাওয়া স্বাধীনতার স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছিল স্বাধীনতার গোড়াতেই।

কাজেই এই স্বাধীনতাকে শিল্পীর বিমুগ্ধ তুলিকাপাতে অপূর্ব বর্ণালীর আকার দেওয়ার কোন তাগিদই তিনি অনুভব করেননি নিজের ভিতর কখনও, বরং যখনই সুযোগ পেয়েছেন এর পোকায়-খাওয়া জীর্ণ-দষ্ট বাসী রূপটিকে তুলে ধরেছেন পাঠকদের সামনে নির্মম নিরপেক্ষ ভাবে। সমাজতন্ত্রের আদর্শের হাঁকডাক আজকাল ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে, কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যে সমাজতন্ত্রের সবচেয়ে সার্থক রূপকার যদি কেউ থেকে থাকেন তো তিনি—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি তথাকথিত স্বাধীন সমাজের পচা-গলা-ক্ষয়শীল রূপটাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন সবাইকে আর এই অধঃপতিত সমাজ-কাঠামোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে তার চূর্ণাস্থির উপর নতুন সমাজ গড়ার জানিয়েছিলেন আহ্বান। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এই জীবনের মূল্যে সাহিত্যসাধনাকারী আপসহীন লেখকটি স্বাধীনতার পরে অল্পকালই বেঁচে ছিলেন। জীবনকে তিল তিল করে ক্ষয় করে যিনি সাহিত্যে কেবলমাত্র সত্যবস্তুই পরিবেশন করেছেন, মিথ্যার রঙীন সম্মোহনকে কখনও প্রশ্রয় দেননি জীবনে কিংবা লেখায়, তিনি দীর্ঘায়ুর প্রসাদ পাবেন, আমাদের এই হতভাগ্য সমাজ-ব্যবস্থায় এমনটা বড় হয় না। বেঁচে থাকলে এই তথাকথিত স্বাধীনতাকে তিনি আরও তুলোধুনো করে ছাড়তেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থের বিচারে এক দিক দিয়ে তাঁর অকাল-মৃত্যু স্বস্তিকর হয়েছে বলতে হবে!

কাব্যের ক্ষেত্রে এলে দেখতে পাই বেশির ভাগ কবিইআত্মমগ্ন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, রোমান্টিক স্বপ্নালুতায় আচ্ছন্ন। তাঁদের এই আত্ম-লীনতার সংস্কার সুফলপ্রসূ হতে পারত যদি তাঁরা শক্তিমান কবি হতেন —কিন্তু অধিকাংশই ফ্যাসানের বশে কবি, কবিতা লেখাটা সৌখীন সাহিত্যিক সমাজে সবচেয়ে চালু নিয়ম বলেই তাঁরা কবি। এই আত্মমুখী অন্তর্নিবেশী ধারার কবিতার শেষ সার্থক প্রতিনিধি হলেন জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, এবং কতক পরিমাণে বুদ্ধদেব বসু। বাকী সব ঝড়তি-পড়তির দল। আত্মলীনতায় বুঁদ হয়ে থেকে সমাজকে অস্বীকার করার মধ্যেই এঁদের ক্ষমতার সীমা। তবে ভরসা এই যে, এই সমাজ-অচেতন কবিরাই একমাত্র কবিকুল নন; তাঁদের বাইরে আর এক কবি-গোষ্ঠী আছেন যাঁদের কবিতায় সুস্পষ্ট সমাজ-মুখিনতার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে পূর্ববর্তী যাঁরা, তাঁদের নাম আগেই উল্লেখ করেছি—কাজী নজরুল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি। এঁদেরই ধারাবাহী (কেউ-কেউ বা সমসাময়িক) সমাজসচেতন কবি হলেন—বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ,

দিনেশ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, শ্যামসুন্দর দে, কনক মুখোপাধ্যায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

এঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য বিষ্ণু দে (যিনি এবার জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন), তবে তাঁর রচনার আঙ্গিক উচ্চাবচ, বন্ধুর, অমসৃণ—সাধারণ কাব্যামোদী পাঠকের পক্ষে কিয়ৎপরিমাণে দুষ্প্রবেশ্য। রবীন্দ্র-আঙ্গিকের বিপরীতে তিনি কবিতায় একটি নতুন আঙ্গিকের প্রবর্তন করেছেন ঠিক কিন্তু সেই সঙ্গে কবিতাকে তিনি মাত্র কতিপয়ের ভোগ্য-বস্তুতে পরিণত করেছেন, 'সম্মোহিত চক্রে'র বাইরে তাঁর কবিতার আবেদন নিতান্ত সীমিত, সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। উচ্চতর পর্যায়ের কবিতা হলেই তা কতিপয়ের মাত্র উপভোগের বস্তু হবে, সাধারণ পাঠকের তাতে প্রবেশাধিকার থাকবে না—এর চাইতে ভ্রমাত্মক সংস্কার আর কিছু হতে পারে না। শিল্পোপভোগের ব্যাপারে এটা একটা মস্ত ভুল ধারণা, যে-ভুল ধারণা সহস্রবার এলিয়ট-এজরা পাউণ্ডের দোহাই পাড়লেও নিরাকৃত হবার নয়। শ্রেষ্ঠ শিল্পের বেলায় অধিকারী-অনধিকারী ভেদ যে একটা কথার কথা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ উচ্চতর সংগীত, উচ্চতর চিত্রকলা। ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ সাহেব কিংবা ওস্তাদ গোলাম আলি খাঁ সাহেবের গান সাধারণ শ্রোতার দল চমৎকার উপভোগ করতে পারতেন তার বহুতর নজীর আছে। শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথ কিংবা শিল্পাচার্য যামিনী রায়ের ছবির ব্যাকরণ না জেনেও তাঁদের শিল্পসৌন্দর্যের উপভোগ সম্ভব এমনি তাঁদের চিত্রকলার সর্বজন-গ্রাহ্যতা। উৎকৃষ্ট গান আর ছবি সম্পর্কে যদি এ-কথা সত্য হয় উৎকৃষ্ট বলে কথিত বিষ্ণু দে-র কবিতার বেলাতেই বা সে-কথা সত্য হবে না কেন। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় বিষ্ণু দে-র কাব্যের আবেদন সীমাবদ্ধ।

আর একটি কিংবদন্তী বিষ্ণু দে সম্পর্কে প্রচলিত, তা হলো: তিনি রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী কবি। এটিও একটি অগ্রহণীয়

মতবাদ। যাঁরা এ ধরনের কথা প্রচার করেন তাঁদের বিপ্লব সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই বলতে আমি বাধ্য। বিপ্লবের দাবি জীবনের মূল্যে পূরণ করতে হয়, সারা জীবন বহাল-তবিয়তে সরকারী শিক্ষা বিভাগে চাকুরি করে ও তার সর্ববিধ সুবিধা ভোগ করে বিপ্লব হয় না। আমাদের দেশে এই কালে নজরুলের পরে দুজন মাত্র বিপ্লবী লেখক জন্মেছেন, তাঁদের নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্য।

নাট্যক্ষেত্রে সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়গুলি (যথা, লিটল থিয়েটার গ্রুপ, বহুরূপী, থিয়েটার সেণ্টার, শৌভনিক, নান্দীকার, রূপকার প্রভৃতি) সমাজ-সমস্যামূলক নাটক উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নানাবিধ নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, এটা খুবই উৎসাহের কথা। পেশাদার থিয়েটার-ওয়ালাদের ধরনে বস্তাপচা পুরনো ঐতিহাসিক ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক মঞ্চস্থ করবার বদলে তাঁরা যে নতুন কালের সমস্যার রূপায়ণমূলক নতুন নাটকের দিকে ঝুঁকেছেন এতে তাঁদের যুগ-সচেতনতারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋত্বিক ঘটক, ডাঃ ধীরেন গাঙ্গুলী প্রমুখ নাট্যকার-পরিচালক-প্রযোজকদের পরিবেশিত নাটকে ও চলচ্চিত্রে সমাজ-চৈতন্যের সুস্পষ্ট সুর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, এতে বাংলা দৃশ্য শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনে আশার সঞ্চার করে। তবে এই আশা আশঙ্কা-বিরহিত নয়।

সম্প্রতি পশ্চিমী নয়া নাট্যের অনুকরণে এদেশেও 'অ্যাবসার্ড' নাটক প্রণয়ন ও মঞ্চস্থ করবার দিকে একটা ঝোঁক দেখা গিয়েছে কোন কোন নবীন নাট্যকার ও নাট্যপ্রযোজকের মধ্যে। এই ঝোঁক সম্বন্ধে সতর্ক হবার কারণ উপস্থিত হয়েছে। 'অ্যাবসার্ড' নাটক আঙ্গিকের দিক দিয়ে নবীনত্বপ্রয়াসী হলেও তার বিষয়বস্তুতে প্রায়ই রোমান্টিক কল্পনাসুলভ নৈরাজ্যের প্রাধান্য। চিন্তার উচ্ছৃঙ্খলতা এই গোত্রের নাটকের একটি 'সামান্য লক্ষণ'। বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর এ একেবারে বিরুদ্ধ জিনিস। আর যেখানে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী নেই, সেখানে 'কর্মের'ও পরিচ্ছন্নতা নেই, নেই বিষয়ের সমাজমুখিনতা। ব্যক্তিক

উৎকেন্দ্রিকতার নৈরাজ্যে এ-জাতীয় নাটকের আবেদন হারিয়ে যেতে বাধ্য।

বাংলা সাহিত্যের গত পঁচিশ বছরের ইতিহাস আলোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে পারা যায় না যে, এই সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সম্যকরূপে প্রতিফলিত হয়নি, শুধু গতানুগতিক সমুদ্রের সুবিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে এবড়ো-খেবড়ো ভাবে ভেসে-ওঠা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ-খণ্ডের মত এখানে-সেখানে কিছু ব্যতিক্রমী সমাজতান্ত্রিক নজীরের দেখা মেলে মাত্র। কেন এই অবস্থা হয়েছে তার কারণ দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে আলোচনার গোড়ায়। এই হেতু নির্ণয়চেষ্টা আরও একটু সম্প্রসারিত করে বলা যায় যে, স্বাধীনতাকে আমরা একটি বহিরঙ্গ প্রাপ্তি হিসাবেই গ্রহণ করেছি, তাকে অন্তরের বস্তু করে তুলতে পারিনি। স্বাধীনতার প্রকৃত সংজ্ঞা হলো নিজেকে নিজের বশে আনা, সেই অর্থে আমরা স্বাধীনতাকে নিইনি, আমরা স্বাধীনতাকে নিয়েছি মর্জিমাফিক যা-খুশী তা করার ছাড়পত্র রূপে। স্বাধীনতা আমাদের চোখে যদৃচ্ছ আচরণের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সমাজে অস্থিরতা, সাহিত্যে অস্থিরতা নিছকই নেতিধর্মী। এর কোন গঠনমূলক দিক নেই। রাষ্ট্রে ও সমাজে যেমন অস্থিরতার প্রকাশ ঘটেছে নানা উচ্ছৃঙ্খল কার্য-কলাপে, এত কালের সযত্নলালিত নানা শ্রদ্ধেয় মূল্যবোধের বিপর্যয়ে; সাহিত্যেও তেমনি এই অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে নিছকই অন্ধকারধর্মী অবক্ষয়ী ব্যাপক রচনা প্রচেষ্টার মধ্যে। নানা রুচিবিগর্হিত অন্যায্য জীবনচিত্রণে সাহিত্যের পাতা ভরে গেল। সেটা আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে এই জন্য যে, এই অতিবাস্তব জীবন-চিত্রণের পিছনে কোন কল্যাণকর সামাজিক উদ্দেশ্য নেই, উদ্দেশ্য যদি কিছু থাকে তো সে বৈষয়িক উদ্দেশ্য। শুধুই পাঠকের রিরংসা প্রবৃত্তিতে সুড়সুড়ি দিয়ে মুনাফা বৃত্তি চরিতার্থ করবার এ এক ফন্দি।

অপর পক্ষে, বিদেশী শাসকের পরিবর্তে জাতীয় নেতৃবর্গ দেশের শাসন-তান্ত্রিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে দেশবাসীর সামনে জাগতিক অবস্থা

সমুন্নয়নের নানা সুযোগ-সুবিধা অপরিমিত হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রীয় ভাগ্য-নিয়ন্তাদের হাতে অনুগ্রহ বিতরণের ঢালাও ক্ষমতা ন্যস্ত ও নিহিত। একদিকে পারমিট লাইসেন্স মঞ্জুরী-করণ ইত্যাদির অবাধ দানসত্র খোলা, অন্যদিকে উপাধি, পুরস্কার, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ইত্যাদির প্রলোভন উদার হাতে করা হয়েছে বিস্তার। দুইয়ের প্রকৃতিতে ভিন্নতা থাকলেও আসলে দুই-ই টোপ। লাইসেন্সও যা, সাহিত্যিক পুরস্কারও তা। সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই এই টোপ গেলবার জন্যে আগু বাড়িয়ে থাকেন, প্রকৃত-প্রস্তাবে কেউ কেউ এই আশাতেই লেখনী সঞ্চালন করে থাকেন। ফলে সাহিত্যিক তাঁর স্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছেন, সাহিত্যের আসল কাজ ভুলে কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জন, স্থিতাবস্থার মহিমাকীর্তন ইত্যাদিকেই স্বীয় করণীয় কাজ বলে জেনেছেন। মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্ত বাদ দিলে, অধিকাংশ লেখকই 'এস্টাব্লিশমেণ্ট'-এর সহযোগী হয়ে পড়েছেন। তাঁদের স্বাধীন বিচার ও সমালোচনা প্রবণতা চাপা পড়ে গেছে। এমনতরো অবস্থায় উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে চাই স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন মনন, তীক্ষ্ণ সমালোচনী প্রতিভা। স্বাধীন চিন্তার গর্ভ থেকেই প্রকৃত সৃষ্টিশীলতার জন্ম হয়ে থাকে। নির্ভীক সমালোচনী প্রবৃত্তিও সাহিত্যকে সচল ও জীবন্ত রাখবার একটা প্রধান উপায়। পূর্বেও বলেছি আবারও বলি, যে-কোন প্রকার তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টির একটা মূল শর্ত হলো, বিদ্রোহের মনোভাব —প্রচলিত মূল্যবোধগুলিকে সংশয়াপন্ন দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখার প্রবৃত্তি এবং ওই বিচারণার ফলে তাদের কোন কোনটি অসার প্রতিপন্ন হলে প্রয়োজনে তাদের স্থলে নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা। এই প্রশ্ন করার মনোবৃত্তি, **questioning attitude,** না থাকলে সাহিত্যে গতিবেগ আনাই সম্ভব হয় না। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের নিশ্চলতার একটা মুখ্য কারণ এই মনোবৃত্তির অভাব। বাংলা সাহিত্যকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হলে সকল প্রকার গতানুগতিক ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে প্রশ্নচিহ্নটিকে উদ্যত করে রাখতেই হবে।